
জানবার
কথা
দশ



জানবার কথা

দশম খণ্ড

জানবার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

সাক্ষর
লি মি টে ড

॥ প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর,১৯৫৪ ॥

প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর : নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৩৭২, রসা রোড সাউথ, কলকাতা ৩৩ ॥ বাঁধিয়েছেন : ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ১০০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ॥ ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা ৯ ॥

যাঁরা ব্লক তৈরি করেছেন : অমৃতলাল দাস, প্রফুল্ল বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস। যাঁরা শিসের হরফ সাজিয়েছেন : সুকুমার দত্ত, প্রশান্ত নিয়োগী, বিশ্বনাথ মৈত্র, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, সুধীর সাহা। যাঁরা ছাপার যন্ত্র চালিয়েছেন : নারায়ণ দাস, গৌরহরি স্বর্ণকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুদেব দে। যাঁরা বই বাঁধিয়েছেন : আব্দুল হামিদ মিয়া, অনিলচন্দ্র বসাক, গৌরীশঙ্কর দত্ত।

॥ **দাম : প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা** ॥

পরিবেশক : বেঙ্গল পাব্লিসার্স,
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জানবার কথা

॥ লিখেছেন ॥

অশোক ঘোষ
চিন্মোহন সেহানবীশ
জগদীশ দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত দাশগুপ্ত
প্রশান্ত সান্যাল
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রমাকৃষ্ণ মৈত্র
শ্যামল চক্রবর্তী
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

॥ ছবি এঁকেছেন ॥

অমূল্য দাশ
জ্যোৎস্না ঘোষ-দস্তিদার
প্রবীর দাশগুপ্ত
হরনারায়ণ দাশ

॥ প্রচ্ছদপট ॥

খালেদ চৌধুরী

॥ উৎসর্গ ॥

যারা দুনিয়াকে জেনে দুনিয়াকে বদলাবে
যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে
নতুন ভবিষ্যৎ যারা মুঠোয় আনবে
আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো
ছেলেমেয়েদের
উদ্দেশে



সত্যের সন্ধানে মানুষ

এই বইতে ঠিক কী আলোচনা করতে চাই? আলোচনা করতে চাই, আদিম যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষ দুনিয়াটাকে কীভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছে, কীভাবে বুঝতে চেয়েছে নিজেকে। মানুষকে।

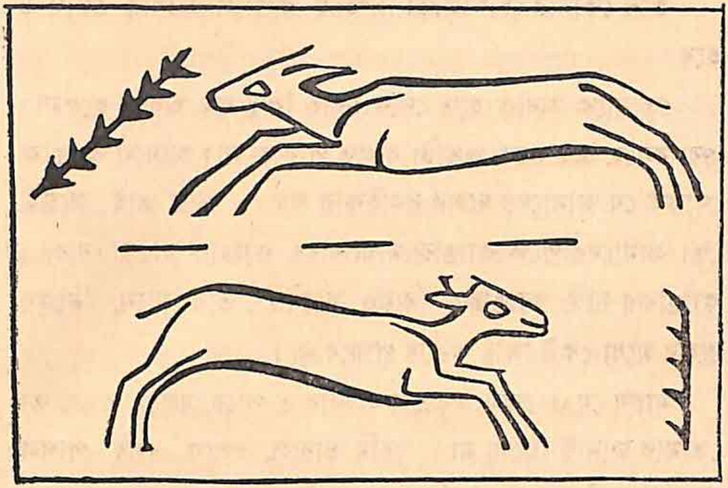
আমাদের মাথায় অনেক রকমের ধারণা রয়েছে। কোনো ধারণা পুরোনো যুগের। কোনো ধারণা নতুন যুগের। ধারণাগুলো এলো কোথা থেকে ধারণাগুলোর মধ্যে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল?

আমরা নানান সময় নানান কথায় বিশ্বাস করি। আমাদের পক্ষে জানা দরকার, কোন বিশ্বাসটা ঠিক, কোন বিশ্বাসটা ভুল। কী করে বুঝবো কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল?

পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। তাঁরা অনেক জ্ঞানের কথা বলেছেন। সেগুলো জানা দরকার। বোঝা দরকার।

এই বইটায় প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক জ্ঞানীর কথা আলাদা-আলাদা করে আলোচনা করবার মতো জায়গা হবে না। আমরা তাই মোটের ওপর বিশেষ করে তাঁদের কথাই তুলবো সত্যের সন্ধানে মানুষের অভিযানে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বড়ো।

তাছাড়াও আমরা আলোচনা করবো নানান যুগের নানান মানুষের নানান ব্যবহার নিয়ে। কেননা, এই ব্যবহারগুলোর পেছনে লুকিয়ে আছে এমন বিশ্বাস যা সহজে চোখে পড়তে চায় না। অথচ সেগুলির প্রভাব আমাদের জীবনে খুবই প্রবল। বিশ্বাসগুলো যদি ভুল হয় তাহলে তার প্রভাবে আমরা ভুল পথে যাবো। তাই ওই বিশ্বাসগুলোকে ব্যবহারের আড়াল থেকে বের করে আনতে হবে আর বিচার করে দেখতে হবে সেগুলো ঠিক না ভুল।



আমরা হলাম সূর্যমুখী ফুল

চলো একবার অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে আসা যাক।

ওদেশের আনাচে-কানাচে আজো নানান আদিবাসীর দল অসভ্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারা কী ভাবছে-না-ভাবছে শুনতে শুনতে তুমি একেবারে অবাক হয়ে যাবে।

একটা দলের একজনকে শুধোনো গেলো, তুমি কে হে বাপু?

লোকটা হয়তো বেমালুম বলে বসবে, আমরা হলাম ক্যাঙারু।

স্বচক্ষে দেখছো জ্বলজ্যান্ত মানুষ, আর বলে কিনা ক্যাঙারু! তুমি ভাবলে, লোকটার নির্ঘাত মাথা খারাপ। তাই তাকে ছেড়ে তারই দলের আর একজনকে শুধোলে, তুমি কে হে বাপু?

সেও শুধু বলবে, আমরা হলাম ক্যাঙারু।

শুনে তোমার চোখজোড়া নিশ্চয়ই কপালে ওঠবার জোগাড় হবে।

তোমাকে অবাক হতে দেখে ওরাও কিন্তু কম অবাক হবে না। ওরা বলবে, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছো না? আসলে ক্যাঙারু থেকেই যে আমাদের দলের সবাইকার জন্ম। আর তাই জন্যেই তো আমাদের পক্ষে ক্যাঙারু মারা বারণ, ক্যাঙারু খাওয়া বারণ। ক্যাঙারুর সঙ্গে ক্যাঙারুর বিয়েও বারণ। তার মানে, নিজের দলের মধ্যে কেউ বিয়ে করতে পারবে না।

মানুষ যে এ-রকম অদ্ভুত কথা ভাবতে পারে, বলতে পারে, তা তোমার জানাই ছিলো না। তুমি ভাবলে, দলকে দলই পাগল হবে বা! ওদের ছেড়ে তুমি আর-একটা দলের কাছে গেলে।

তুমি তাদের শুধোলে, তোমরা কারা গা?

ওরা হয়তো বলবে, আমাদের চেনো না? আমরা হলাম সূর্যমুখী ফুল।

সূর্যমুখী ফুল মানে?

ওরা বলবে, তাও বুঝছো না? সূর্যমুখী ফুল থেকেই যে আমাদের সবাইকার জন্ম। আর তাই জন্যেই তো আমাদের পক্ষে সূর্যমুখী ফুল খাওয়া বারণ, সূর্যমুখী ফুলকে বিয়ে করা বারণ।

তুমি দেখলে, এরাও যে একই রকম কথা বলে! কেবল, জন্তুর বদলে গাছগাছড়া—এই যা তফাত!

তুমি শুধোলে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে কি ক্যাঙারু খাওয়া বারণ?

ওরা বলবে, বারে! তা আবার বারণ হবে কেন? আমরা তো আর ক্যাঙারু নই যে ক্যাঙারু খাওয়া বারণ হবে!

ওরা কী ভাবছে-না-ভাবছে সে কথা এতোক্ষণে তোমার কাছে একটুখানি স্পষ্ট হলো। একটা দলের সব মানুষই কোনো জন্তুজানোয়ার বা কোনো গাছগাছড়ার নাম থেকে নিজেদের নামকরণ করছে। ভাবছে, তারা সবাই ওই জন্তুরই, বা ওই গাছেরই বংশধর। আর এই ভাবনার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে কয়েক রকমের নিষেধ বা "বারণ"। খাওয়া বারণ। বিয়ে বারণ। প্রধানত এই দু রকমের বারণ।

আমরা হলাম কাশ্যপ গোত্র

তারপর তুমি অষ্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতায় ফিরে এলে। কলকাতার রাস্তায় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো। তুমি শুধোলে, আপনার গোত্রটা কী মহাশয়?

আমরা? আমরা হলাম চাটুজ্জ্যে। কাশ্যপ গোত্র। কাশ্যপ বুঝছো না? কাশ্যপ মানে হলো কাছিম। আর তাই জন্যেই তো আমাদের পক্ষে কাছিম খাওয়া বারণ, কাশ্যপ গোত্রের কাউকে বিয়ে করা বারণ।

অষ্ট্রেলিয়া গিয়ে তুমি যা দেখে এসেছো আমার কথা শুনে তোমার হঠাৎ সেই কথাগুলো মনে পড়ে যাবে না?

তারপর, তুমি কলকাতা ছেড়ে মেদিনীপুর গেলে। সেখানে শুনলে কারুর নাম অমুখ বাঘ, কারুর নাম তমুখ হাতি, কেউ আবার শেয়াল মশায়। খোদ মানুষদের এই রকম নাম

—গাছগাছড়া বা জন্তুজানোয়ার থেকে ধার করা নাম—আজকাল আর তোমার নজর এড়িয়ে যায় না।

মেদিনীপুর থেকে তুমি সোজা চললে সাঁওতাল পরগনায়। দেখলে, পশুপাখি আর জন্তুজানোয়ারের নাম থেকে মানুষের দলের নামকরণ করবার ব্যবস্থাটা আরো স্পষ্ট হয়ে আসছে। সাঁওতালরা বললো, তাদের কোনো দলের নাম এর্গো, কোনো দলের নাম মুর্মু। এর্গো মানে ইঁদুর। মুর্মু মানে নীলগাই। আবার কোনো দলের নাম হেমরন, কোনো দলের নাম মারুড়ী। হেমরন মানে সুপুরি। মারুড়ী মানে জংলি ঘাস।

সাঁওতালদের ছেড়ে তুমি বহুদূর চলে গেলে। একেবারে মহীশূর। গিয়ে শুনলে, কারুর নাম আড়ু, কারুর নাম আনে। আড়ু মানে ছাগল, আনে মানে হাতি। আবার কারুর নাম অরসু, কারুর নাম অট্টি। অরসু মানে বট। অট্টি মানে ডুমুর।

এইভাবে তুমি যদি ভারতবর্ষের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসো তাহলে দেখবে পশুপাখি আর গাছগাছড়ার নাম থেকে মানুষের নামকরণ করবার বহর এদেশেও বড়ো কম নয়। সেই সঙ্গেই তোমার চোখে পড়বে, এই ধরনের নামকরণের সঙ্গে ওই দু'রকম 'বারণের'ও সম্পর্ক : খাওয়া বারণ, বিয়ে বারণ।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। আমাদের দেশের সব মানুষই তো আর সমান সভ্য নয়। এখানে-ওখানে নানা রকম আদিবাসীর দল। তারা অনেকখানিই পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। আর তাদের মধ্যেই এই ধরনের বিশ্বাস অনেক বেশি

স্পষ্ট। তবুও তোমার-আমার মতো সভ্য-ভব্য মানুষের মন থেকেও এ-ধরনের ধারণাগুলো একেবারে মুছে যায় নি। যেমন, আমাদের ওই গোত্র-নাম। তাহলে, আদিবাসীদের ধারণার টুকরো-টাকরা চিহ্ন আজো আমাদের মনে টেঁকে রয়েছে!

টোটেম আর টাবু

তাহলে, অতোদূরের দেশ অষ্ট্রেলিয়ায় যাওয়া কেন? তার কারণ, ওদেশের অসভ্য আদিবাসীদের মধ্যেই এ-ধরনের ধারণার সবচেয়ে আদি ও অকৃত্রিম রূপ। তাই আমাদের দেশে যে-কথা আবছা হয়ে এসেছে সে-কথা ভালো করে বুঝতে হলে একবার ওদের দেখে আসা ভালো। ওদের মধ্যে আজো এই ধারণা স্পষ্টভাবে টেঁকে রয়েছে।

এবার সমস্যা, ব্যাপারটার নামকরণ করা নিয়ে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদেরই শুধোনো যাক।

ওদেশে ওজিবওয়া বলে এক জাতের লোক আছে। তাদের ভাষায় বলে টোটেম্।

টোটেম্ মানে কী? মানুষের দলটা যে-জন্তু বা যে-গাছের সঙ্গে নিজেকে এক মনে করছে সেই জন্তু বা সেই গাছই হবে দলটার টোটেম্। টোটেম্ থেকেই নাকি দলের সবাইকার জন্ম।

আমরা সবাই সূর্যমুখী ফুল। তার মানে, সূর্যমুখী ফুলই আমাদের দলের টোটেম্।

আমরা সবাই কাশ্যপ গোত্র। তার মানে? তার মানে কি এই যে এককালে আমরাও—অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষেরা—

ওই রকম আদিম ও অসভ্য অবস্থায় ছিলাম আর তখন কাছিমই ছিলো আমাদের দলের টোটেম ?

টোটেম্-বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু কিছু বারণের সম্পর্ক রয়েছে। তোমার পক্ষের তোমার দলের টোটেম্ খাওয়া বারণ। তোমার পক্ষের তোমারই টোটেম্-দলের কাউকে বিয়ে করা বারণ। কেন বারণ ?--এ প্রশ্ন কেউ তুলবে না। বারণ, ব্যস। আর কোন কথা নেই।

ওজিবওয়াদের ভাষায় এই ধরনের বারণগুলোর নাম হলো টাবু।

তাহলে ওদের কাছ থেকে দুটো নাম শিখে ফেলা গেলো। টোটেম্ আর টাবু।

শুরুতেই আদিম মানুষদের কথা কেন ?

আমরা তো আলোচনা করতে বসেছি : সত্যের সন্ধানে মানুষ। যুগের পর যুগ ধরে মানুষ কী ভেবেছে-না-ভেবেছে, দুনিয়াটাকে কীভাবে চেনবার চেষ্টা করেছে—তারই কাহিনী। আর যদি সেই কথাই আলোচনা করতে হয় তাহলে তো জ্ঞানী-দের বাণী থেকেই শুরু করা উচিত। আদিম আর অসভ্য মানুষের মাথায় কোন ধরনের কিম্ভূত-কিমাকার ধারণা তা জেনে আমাদের লাভ কী ?

লাভ আছে। আদিম মানুষদের বিশ্বাসগুলো কোন ধরনের তা ভালো করে বুঝতে না পারলে সত্যের সন্ধানে মানুষের কাহিনী আমরা ঠিকমতো ঠাহর করতেই পারবো না।

আজকের মানুষ খুবই সভ্য হয়েছে। মানলাম। আজকের মানুষ জানতে পেরেছে অনেক কথা, ভাবতে শিখেছে অনেক ভালো করে। মানলাম। কিন্তু এ-সব তো আর রাতারাতি সম্ভবপর হয়নি। যুগের পর যুগ ধরে, নানান রকম চেষ্টা চালাতে চালাতে, শেষ পর্যন্ত মানুষ আজ এতোখানি উন্নত হয়ে উঠেছে। আজ না হয় সে বিজ্ঞ হয়েছে, বড়ো হয়েছে। কিন্তু এককালে তো সে ছেলেমানুষই ছিলো। ওই আদিম আর অসভ্য অবস্থাটা তার সেই ছেলেমানুষের দশা।

বহুযুগ আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কীভাবে বাঁচতো, কী ভাবতো, কী বিশ্বাস করতো,—তা জানতে পারবার একটা উপায় হলো আজকের দিনেও ওই যে-সব অসভ্য আদিবাসীর দল টেকে রয়েছে তাদের মধ্যে একবার ঘুরে আসা,—দেখে আসা তারা কীভাবে বাঁচছে, কী ভাবছে, কী বিশ্বাস করছে।

এক কথায়, পৃথিবীর সব মানুষই একসঙ্গে সমান উন্নত হয়নি। কেউ কেউ এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর, কেউ কেউ আজো অনেকখানি পেছিয়ে পড়ে রয়েছে। এই এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের ভুলে-যাওয়া অতীতটাকে আবিষ্কার করবার একটা উপায় হলো পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলোর খবর জোগাড় করা।

তাছাড়া, আরো একটা কথা আছে। অসভ্য অবস্থাটাকে পেছনে ফেলে সভ্য হয়ে ওঠবার পরও মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত অসভ্য অতীতের অভ্যাসটাকে পুরোপুরি ছাড়তে পারেনি। সভ্য মানুষের মনের ধারণা আর বিশ্বাসের মধ্যে টেকে থেকেছে আদিম যুগের নানান রকম বিশ্বাস। তাই বিশেষ করে প্রথম দিককার

যে সভ্যতা তার কথা ভালো করে বুঝতে হলে জানা দরকার অসভ্য দশার কথাটা।

বাজপাখি থেকে দেবতা

প্রাচীন মিশরের কথাই ধরো না।

সেকালের ঠাকুরদেবতাদের চেহারাগুলো দেখো, মনে হবে যেন এক অদ্ভুত চিড়িয়াখানা দেখছো। কোনো ঠাকুরের পুরো চেহারাটাই সাপ-খোপের মতো বা পশুপাখির মতো। কারুর চেহারা আধা-মানুষ আধা-জানোয়ার ধরনের।

চলো একবার মিশর যাওয়া যাক। স্বচক্ষে দেখে আসা যাক সেইসব ঠাকুরদেবতার চেহারা।

হাজার চারেক বছরের পুরোনো কোনো কবরখানা বা মন্দিরে তুমি হয়তো ছবিতে দেখলে হরিণ ধরনের এক জানোয়ারের পিঠে চেপে বসেছে এক বাজপাখি। তুমি বললে, কেয়া মজা ওই বাজপাখি—দিব্বি হরিণের পিঠে চেপে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে।

কিন্তু তুমি যদি চার হাজার বছর আগেকার মিশর দেশের ছেলে হতে আর আমি যদি হতাম তোমার সেকালের খুড়োমশাই, তাহলে আমরা কী বলাবলি করতাম?

আমি বলতাম, নমো করো খোকা। উনি হলেন দেবতা হোরাস্। কী রকম তেজ দেখছো তো? হরিণের মতো দেখতে দেবতাটিকে জয় করেছেন, বশ করেছেন, নিজের বাহন করে নিয়েছেন।

তার মানে, ওই বাজপাখির ছবি সত্যিই পাখির ছবি নয়। তার বদলে দেবতার মূর্তি। তুমি গড় হয়ে প্রণাম করতে। আমিও গড় হয়ে প্রণাম করতাম।

আর এক জায়গায় আমরা দেখলাম : সার বেঁধে চলেছে তিনটে বিধ্‌ঘুটে-দেখতে জানোয়ার। সেগুলোর চেহারা এমনই মজাদার যে দেখতে দেখতে তুমি প্রায় হেসে গড়িয়ে পড়বার জোগাড় করলে। কিন্তু তুমি যদি চার হাজার বছর আগেকার মিশর দেশের ছেলে হতে ? তাহলে ওদের দেখেই লুটিয়ে পড়তে ধুলোর ওপর, প্রণাম করতে সাষ্টাঙ্গে, বলতে : ঠাকুর আমায় দয়া করো।

তাহলে দেখতেই পাচ্ছো, যেখানে পৃথিবীর সব-প্রথম সভ্যতা সেখানের মানুষের ধারণায় দেবদেবীদের চেহারাগুলো কী রকম কিম্ভুত-কিমাকার।

আর তাই জন্যেই প্রশ্ন তুলতে হয় : সেকালের মানুষ ঠাকুর-দেবতা বলতে এ-রকম অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা কল্পনা করলো কেন ? এ-কথা ভালো করে বুঝতে হলে ভেবে দেখতে হবে ওই প্রাচীন যুগে ঠিক কেমনভাবে সভ্যতা গড়ে উঠলো।

তখনো পৃথিবীর কোথাও মানুষ সভ্য হয়নি। অসভ্য মানুষের দল খাবারের আশায় হন্যের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এদিকে, নীল নদের একূল-ওকূল দুকূল জুড়ে আশ্চর্য উর্বর জমি, মানুষ যেন না-চাইতেই পেয়ে যায় সোনার ফসল। এদিক-ওদিকের অসভ্য যাযাবর মানুষের দল খবর পেতে লাগলো এই আশ্চর্য দেশটির। তারা দলে

দলে এসে নীল নদের কিনারায় আস্তানা গাড়তে লাগলো। তারা তখনো আদিম ও অসভ্য দশায়, তাই হরেক রকম টোটেম্-দলের মানুষ—এক একটা দল এক একটা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে নিজেকে এক মনে করছে। তাই নানা রকম জন্তু-জানোয়ার দিয়েই নানান দলের পরিচয়।

এখানে বাজপাখির বাসা, ওখানে শেয়ালের বাসা, সেখানে গোরুর বাসা। তার মানেই হলো এখানে একদল মানুষ আড্ডা গাড়লো যাদের টোটেম্ বাজপাখি, ওখানে আর একদল মানুষ আড্ডা গাড়লো যাদের টোটেম শেয়াল, সেখানে আর একদল মানুষ আড্ডা গাড়লো যাদের টোটেম্ কিনা গোরু।

এই কথাটাই যদি ছবি একে বলতে চাই? তাহলে আঁকতে হবে: নীল নদের দুকূল জুড়ে রকমারি জন্তুজানোয়ারের আড্ডা জমতে লাগলো।

শুরুতেই কিন্তু এই সব জানোয়াররা ঠাকুর-দেবতা হয়ে ওঠেনি। তার বদলে দলের টোটেম্। টোটেম্ আর দেবতা—দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত। দেবতার পায়ে মানুষ মাথা কুটছে, দেবতার কাছে মানুষ মানত করছে—দেবতার করুণা হবে, তিনি মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। কিন্তু সূর্যমুখী ফুল যে-দলের টোটেম্ সেই দলের সবাই বলছে: আমরা হলাম সূর্যমুখী ফুল। তার মানে, তাদের ধারণায় ওই টোটেম্ আর মানুষ একেবারে এক। মানুষ তাই টোটেমের পায়ে মাথা খুঁড়ছে, টোটেমের কাছে মানত করছে—এ-ধরনের কথার কোনো মানেই হয় না।

আসলে, টোটেম্ দলের মধ্যে সব মানুষই সমান। তফাত নেই রাজায় প্রজায়, তফাত নেই বড়োলোক-গরিবলোকে। আর তাই জন্যেই এ-অবস্থায় মানুষ মাথা-কোটবার মাহাত্ম্যটা মোটেই শেখে নি। বড়োলোকের কাছে গরিব লোক যদি ভিক্ষে চায় তাহলে ভিক্ষে মিলতে পারে। কিন্তু যে-অবস্থায় বড়োলোক-গরিবলোকের তফাত দেখা দেয় নি? সেই অবস্থায় নিশ্চয়ই ভিক্ষে চাইবার কথাটাই মানুষের মাথায় আসতে পারে না। রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়লে রাজার মনে করুণা জাগতে পারে। কিন্তু যতোদিন পর্যন্ত রাজায়-প্রজায় তফাতই দেখা দেয় নি? ততোদিন পর্যন্ত পায়ে মাথা কুটে করুণা কুড়োবার কথাও ওঠে না।

তাই, আদিম যুগে মানুষের মনের বিশ্বাসটা একেবারে অন্য রকমের। ঠিক যে কী রকমের বিশ্বাস সে-কথা একটু পরেই আলোচনা করবো। আপাতত যে-কথা বলছিলাম। দেবতার জন্ম নিয়ে কথা। আদিম টোটেম্-দল ভেঙে যখন বড়োলোক-গরিবলোকের তফাত দেখা দিচ্ছে, দেখা দিচ্ছে রাজায়-প্রজায় তফাত, শুধুমাত্র তখনই মানুষের মনে পুজো-পাঠ, মাথা-কোটা মানত-করা,—এই সব ব্যাপারে বিশ্বাস জাগা সম্ভব।

সুখের বিষয়, প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে এই কথাটা স্পষ্টভাবে টিকে রয়েছে। কেননা, মিশরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় কেমনভাবে আদিম টোটেম্-দল ভেঙে রাজা-প্রজায় তফাত দেখা দেবার পাশাপাশিই টোটেম্ বদলে জন্ম হলো দেবতার।

দলে এসে নীল নদের কিনারায় আস্তানা গাড়তে লাগলো। তারা তখনো আদিম ও অসভ্য দশায়, তাই হরেক রকম টোটেম্-দলের মানুষ—এক একটা দল এক একটা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে নিজেকে এক মনে করছে। তাই নানা রকম জন্তু-জানোয়ার দিয়েই নানান দলের পরিচয়।

এখানে বাজপাখির বাসা, ওখানে শেয়ালের বাসা, সেখানে গোরুর বাসা। তার মানেই হলো এখানে একদল মানুষ আড্ডা গাড়লো যাদের টোটেম্ বাজপাখি, ওখানে আর একদল মানুষ আড্ডা গাড়লো যাদের টোটেম শেয়াল, সেখানে আর একদল মানুষ আড্ডা গাড়লো যাদের টোটেম্ কিনা গোরু।

এই কথাটাই যদি ছবি এঁকে বলতে চাই? তাহলে আঁকতে হবে: নীল নদের দুকূল জুড়ে রকমারি জন্তুজানোয়ারের আড্ডা জমতে লাগলো।

শুরুতেই কিন্তু এই সব জানোয়াররা ঠাকুর-দেবতা হয়ে ওঠেনি। তার বদলে দলের টোটেম্। টোটেম্ আর দেবতা—দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত। দেবতার পায়ে মানুষ মাথা কুটছে, দেবতার কাছে মানুষ মানত করছে—দেবতার করুণা হবে, তিনি মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। কিন্তু সূর্যমুখী ফুল যে-দলের টোটেম্ সেই দলের সবাই বলছে: আমরা হলাম সূর্যমুখী ফুল। তার মানে, তাদের ধারণায় ওই টোটেম্ আর মানুষ একেবারে এক। মানুষ তাই টোটেমের পায়ে মাথা খুঁড়ছে, টোটেমের কাছে মানত করছে—এ-ধরনের কথার কোনো মানেই হয় না।

আসলে, টোটেম্ দলের মধ্যে সব মানুষই সমান। তফাত নেই রাজায় প্রজায়, তফাত নেই বড়োলোক-গরিবলোকে। আর তাই জন্যেই এ-অবস্থায় মানুষ মাথা-কোটবার মাহাত্ম্যটা মোটেই শেখে নি। বড়োলোকের কাছে গরিব লোক যদি ভিক্ষে চায় তাহলে ভিক্ষে মিলতে পারে। কিন্তু যে-অবস্থায় বড়োলোক-গরিবলোকের তফাত দেখা দেয় নি? সেই অবস্থায় নিশ্চয়ই ভিক্ষে চাইবার কথাটাই মানুষের মাথায় আসতে পারে না। রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়লে রাজার মনে করুণা জাগতে পারে। কিন্তু যতোদিন পর্যন্ত রাজায়-প্রজায় তফাতই দেখা দেয় নি? ততোদিন পর্যন্ত পায়ে মাথা কুটে করুণা কুড়োবার কথাও ওঠে না।

তাই, আদিম যুগে মানুষের মনের বিশ্বাসটা একেবারে অন্য রকমের। ঠিক যে কী রকমের বিশ্বাস সে-কথা একটু পরেই আলোচনা করবো। আপাতত যে-কথা বলছিলাম। দেবতার জন্ম নিয়ে কথা। আদিম টোটেম্-দল ভেঙে যখন বড়োলোক-গরিবলোকের তফাত দেখা দিচ্ছে, দেখা দিচ্ছে রাজায়-প্রজায় তফাত, শুধুমাত্র তখনই মানুষের মনে পুজো-পাঠ, মাথা-কোটা মানত-করা,—এই সব ব্যাপারে বিশ্বাস জাগা সম্ভব।

সুখের বিষয়, প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে এই কথাটা স্পষ্টভাবে টিকে রয়েছে। কেননা, মিশরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় কেমনভাবে আদিম টোটেম্-দল ভেঙে রাজা-প্রজায় তফাত দেখা দেবার পাশাপাশিই টোটেম্ বদলে জন্ম হলো দেবতার।

প্রাচীন মিশরে যিনি হলেন সব-প্রথম একচ্ছত্র রাজা তাঁর নাম মেনেস্। সেকালের ভাষায় তাঁর পক্ষে একচ্ছত্র রাজা হয়ে বসবার বর্ণনাটা কী রকম? বাংলায় তর্জমা করলে বর্ণনাটা দাঁড়াবে: বাজপাখি গিলে খেলো বাকি সব জানোয়ার। এমনিতে শুনলে তো মনে হয়, বর্ণনাটা নেহাতই আজগুবি ধরনের। কিন্তু তুমি শিখে ফেলেছো টোটেম্-রহস্য। তাই তোমার কাছে বর্ণনাটা আর আজগুবি শোনাবে না।

ধরো, আদিম মানুষের দশটা দল রয়েছে, দশটা দলের নিশ্চয়ই দশ রকম টোটেম্। তার মানে, দশটা দলের কথা হবে দশ রকম জানোয়ারের কথা। তাদের মধ্যে একটা দলের টোটেম্ হলো বাজপাখি। এইবার ভেবে দেখো, ওই বাজপাখি বলে দল যদি বাকি সবকটা দলকে হারিয়ে দিয়ে, বাকি সবকটা দলের উপর প্রভু হয়ে বসে? তাহলে তার বর্ণনাটা কী রকম হবে? বর্ণনাটা হবে, বাজপাখি গিলে খেলো বাকি সব জানোয়ার।

ঠিক এই রকমই এক ব্যাপার ঘটেছিলো আদ্যিকালের মিশরে।

নীল নদের কিনারায় রকমারি টোটেম্-দলের মানুষ এসে আস্তানা গেড়েছিলো। এক-এক দলের পরিচয় এক-এক রকম জন্তুজানোয়ারের চিহ্ন। তাহলে, এই সব নানান দলের মধ্যে লড়াই-এর ছবিটা কী রকম হবার কথা? হরেক রকম জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটির ছবিই। প্রাচীন মিশরের নানান ভাঙাচোরা চিহ্ন থেকে সত্যিই খুঁজে পাওয়া

যায় এই ধরনের অজস্র ছবি। কোন যুগের ছবি সেগুলো? মেনেস্ একচ্ছত্র রাজা হয়ে বসবার ঠিক আগে যুগের ছবিই।

সেই ছবিগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় লড়াইতে ক্রমাগতই জিতে চলেছে বিশেষ করে একটি জানোয়ার। সে জানোয়ার হলো বাজপাখি। তার মানে কী? তার মানে নিশ্চয়ই এই যে নানান রকম টোটেম্ দলের মানুষের মধ্যে যে লড়াই চলেছিলো সেই লড়াইতে জিত হতে লাগলো বাজপাখি-দলের।

এখন মেনেস্ ছিলো এই বাজপাখি দলেরই প্রধান। আর তাই জন্যেই মেনেস্-এর পক্ষে মিশরের একচ্ছত্র রাজা হয়ে বসবার বর্ণনাটা হলো : বাজপাখি গিলে খেলো বাকি সব জানোয়ার।

কিন্তু এই সঙ্গেই আরো একটা ব্যাপার নজর করতে হবে। যতোক্ষণ টোটেম্-দল ততোক্ষণ পর্যন্ত দলের মধ্যে সবাই সমান—তফাত নেই রাজায়-প্রজায়, বড়োলোকে-গরিবলোকে। অষ্ট্রেলিয়া যাও, সে দেশে যে-সব টোটেম্-দল আজো টেঁকে রয়েছে সেগুলো দেখে এসো,—দেখবে, দলের সকলেই নিজেকে টোটেম্‌টির সঙ্গে এক মনে করছে। দলের মধ্যে এর শক্তি বেশি আর ওর শক্তি কম, দলের মধ্যে এ বড়ো ও ছোটো—এই ধরনের কোনো ধারণাই ফুটে ওঠে নি। দলের অবশ্য সর্দার বা নেতা আছে। তার দায়িত্ব নিশ্চয়ই অনেক। কিন্তু তাই বলে প্রভুত্ব নয়। দলের কাজ সে চালায়, কিন্তু দলের সবাইকে ডাক দিয়ে, সভা বসিয়ে, সবাইকার মত পরামর্শ নিয়ে। তার মানে, দলের শক্তিটা ছড়িয়ে রয়েছে পুরো দলের মধ্যে। দলের প্রতিটি মানুষের

মধ্যে সমানে-সমান ভাব। এক গেলাস চিনির সরবতের মধ্যে যেমনভাবে ছড়িয়ে থাকে চিনি—সবটা জলই সমান মিষ্টি। এমন তো আর নয় যে মিষ্টি স্বাদটা শুধুমাত্র এক জায়গায় রয়েছে আর বাকি জলটুকুতে নেই।

কিন্তু গেলাসের সবটুকু চিনিই যদি তলার দিকে থিতিয়ে বসতে চায়? তাহলে নিশ্চয়ই গেলাসের বাকি জলটুকুর মধ্যে আর মিষ্টির স্বাদ পাওয়া যাবে না। সবটুকু চিনিই এক জায়গায় দানা বাঁধবে।

উপমা দিলাম, মেনেস-এর পক্ষে রাজা হয়ে বসবার ব্যাপার-টাকে বোঝবার জন্যে। ওই বাজপাখি দল যতোদিন পর্যন্ত খাঁটি টোটেম্-দল ছিলো ততোদিন পর্যন্ত দলের সবটুকু শক্তি, সবটুকু ঐশ্বর্য পুরো দলটার মধ্যে ছড়ানো। অথচ, ছবিতে দেখা যায়, ওই বাজপাখি দল যতোই কিনা বাকি দলগুলোকে হারিয়ে দিচ্ছে—ছবির ভাষায়, বাজপাখি যতোই গিলে খাচ্ছে বাকি সব জানোয়ার—ততোই পুরো দলের শক্তিটা, পুরো দলের ঐশ্বর্যটা, জমা হয়ে চলেছে একটিমাত্র মানুষের হাতে।

তার মানে, আদিম টোটেম্-দল ভেঙে গেলো।

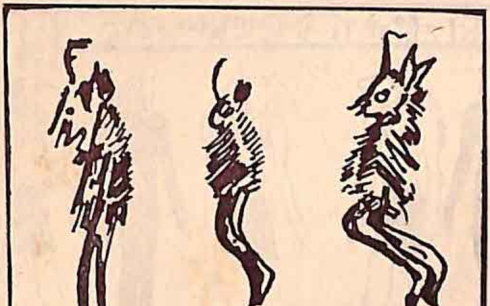
জন্ম হলো রাজার।

আর, সেই সঙ্গে দেবতারও। এইটেই আসলে সবচেয়ে মজার কথা।

বাজপাখি ছিলো বাজপাখি-দলের টোটেম্। কিন্তু বাজপাখি-দল ভেঙে গিয়ে যতোই কিনা রাজা মেনেস্ মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করলো ততোই দেখা গেলো বাজপাখি আর সেই আদিম

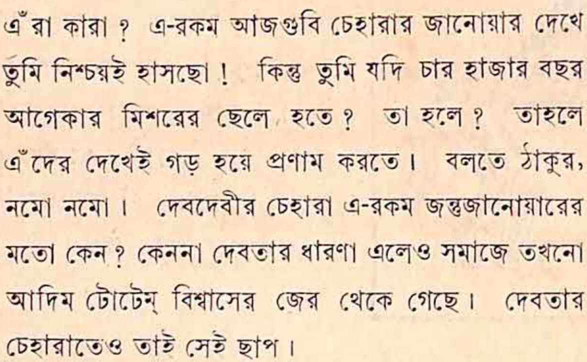


পুরোনো পাথর যুগের ছবি : মানুষগুলো নাচছে শাময় হরিণ সেজে! ওদের গিয়ে যদি শুধোতে, এ-রকম সেজেছো কেন বাপু? ওরা নিশ্চয়ই জবাব দিতো : আমরা সবাই শাময় হরিণ। তার মানে? মানে, আদিম যুগের টোটেম্ বিশ্বাস। এই টোটেম্ বিশ্বাস ভাঙবার পরই ধর্মের জন্ম।

প্রাগৈতি-হাসিক  গুহাচিত্র



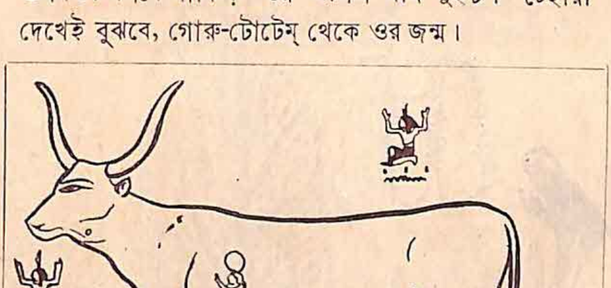
এঁরা কারা ? এ-রকম আজগুবি চেহারার জানোয়ার দেখে তুমি নিশ্চয়ই হাসছো ! কিন্তু তুমি যদি চার হাজার বছর আগেকার মিশরের ছেলে হতে ? তা হলে ? তাহলে এঁদের দেখেই গড় হয়ে প্রণাম করতে। বলতে ঠাকুর, নমো নমো। দেবদেবীর চেহারা এ-রকম জন্তুজানোয়ারের মতো কেন ? কেননা দেবতার ধারণা এলেও সমাজে তখনো আদিম টোটেম্ বিশ্বাসের জের থেকে গেছে। দেবতার চেহারাতেও তাই সেই ছাপ।





ইনি হলেন দেবতা হোরাস্। হরিণের মতো দেখতে দেবতাটিকে বশ করেছেন, নিজের বাহন বানিয়ে নিয়েছেন।

নিচের ছবিতে যে দেবতাটি তাকে কি প্রাচীন মিশরের মা ভগবতী বলবে নাকি? ওর আসল নাম নুইট। চেহারা দেখেই বুঝবে, গোরু-টোটেম্ থেকে ওর জন্ম।



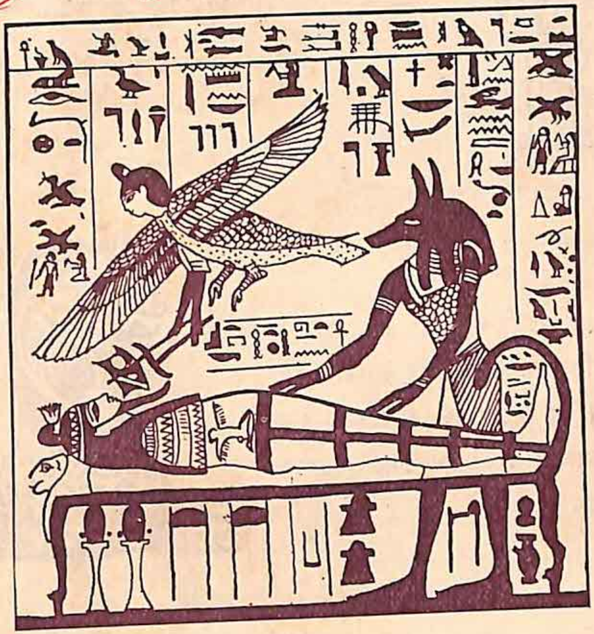


যুদ্ধে বেরিয়েছে দেবতা সিট্—প্রাচীন মিশরে ওর নাম-ডাক খুব জোর। কিন্তু মুখটা ওই রকম শেয়ালের মতো কেন? কোন টোটেম্ থেকে এই দেবতার জন্ম? নিচের ছবিতে রাজা সুটিমোসু নিজের আত্মাটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে! আত্মার চেহারা পাখির মতো কেন? পাখি-টোটেম্ থেকে এ-রকম অদ্ভুত কল্পনার জন্ম।





প্রাচীন মিশরে গাছ-দেবতার পুজো: গাছ-টোটেম্ থেকে গাছ-দেবতার জন্ম?



পাখিও নয়, শেয়ালও নয়। মৃত রাজার কবরের ভেতর দুটি দেবতা উপস্থিত হয়েছে! প্রাচীন মিশরের এই রকম কল্পনা দেখে দেবতার জন্ম নিয়ে কিছুটা কথা শিখে ফেলা যাচ্ছে। আমাদের দেশের বেলায় কী রকম?



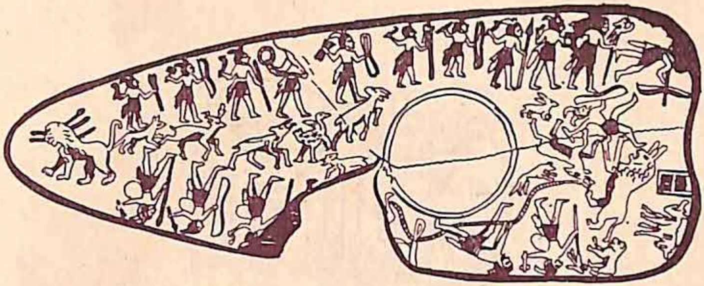
জানোয়ার আর গাছগাছড়া—দুরকম টোটেম্ থেকে এই দেবতাটির জন্ম! প্রাচীন মিশরের দেবতা নয়, প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার।

তাহলে শুধু মিশর নয়। প্রাচীন আসীরিয়াতেও এই রকম। ডানদিকের দেবতাটিকে দেখো না—বাঘ মামা নয়, খোদ ভগবান। কোন টোটেম্ থেকে এর জন্ম?



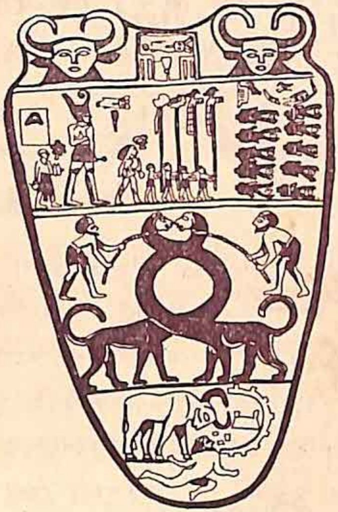


বাঁ পাশেও আসীরিয়ার আর একজন দেবতা: ধড়টা ষাঁড়ের মতো, পিঠে পাখির পাখনা, মুখ কিন্তু রাজা-রাজড়াধরনের। দেবতার সঙ্গে রাজার সম্পর্ক বেশ স্পষ্ট হয়ে আসছে।



দেবতা আর রাজা : ওপরের ছবিতে রাজা মেনেস্ শিকারে বেরিয়েছে। সাঙ্গোপাঙ্গদের ধ্বজায় জীবজন্তুর চিহ্ন। তার মানে ওই সব টোটেম্-দলের মানুষ মেনেসের বশ হয়েছে বা মেনেসের দিক নিয়েছে। মেনেস্-এর নিজের টোটেম্‌টা কী? বাজপাখি। নিচের ছবিতে দেখো, বাজপাখি ধরে এনেছে ক্রীতদাস, রাজাকে উপহার দেবার জন্যে। বাজপাখি থেকে জন্ম হলো দেবতা হোরাস্-এর আর বাজপাখি-টোটেম দল ভেঙে গিয়ে দেখা দিলো রাজা মেনেসের প্রভুত্ব। কিন্তু ওইখানেই আসল কথাটা শেষ নয়। রাজা মেনেস্ আর দেবতা হোরাস্ শেষ পর্যন্ত এক হয়ে গেলো।





রাজা মেনেস্
বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে।
সঙ্গে নানান সাঙ্গোপাঙ্গ—
তাদের ধ্বজা দেখেই বুঝবে কোন
টোটেম্-দলের মানুষ। ডান-দিকে
শত্রুর কাটামুণ্ড—শত্রুরা কে কোন টোটেম্-দলের
মানুষ তাও ছবি থেকে খুঁজে বার করতে পারবে।

টোটেম্ থাকছে না। তার বদলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেবতা। তারই নাম হোরাস্।

দেবতা হোরাসের জন্ম হলো। কিন্তু বাজপাখির চিহ্ন তার চেহারা থেকে লোপ পেলো না। আর তাই জন্যেই তার চেহারাটা ওই রকম জানোয়ারের মতো। বাজপাখির মতো।

তাহলে, দেবতার জন্ম আর রাজার জন্ম—আলাদা কথা নয়। অন্তত, প্রাচীন মিশরের বেলায় এ-কথা এতো স্পষ্টভাবে টিঁকে রয়েছে যে চোখে না পড়াটাই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার। বাজপাখি টোটেম্ থেকে জন্ম হলো দেবতা হোরাস্-এর। বাজ-পাখি-দলের সমানে-সমান জীবন বদলে দেখা দিলো রাজার শক্তি। রাজার নাম মেনেস্। আর সেই সঙ্গেই আরো একটা বিশ্বাস। রাজা মেনেস্ আর দেবতা হোরাস্—সত্যিই তেমন আলাদা নয়। দেবতা হোরাস্ আর রাজা মেনেস্—যেন একই নতুন এক শক্তির এপিঠ-ওপিঠ।

হোরাস্-এর সঙ্গে মেনেস্-এর সম্পর্কটা নিবিড়-নিটোল।

বাজপাখি ডালাভরতি ক্রীতদাস আনছে রাজা মেনেস্-এর জন্যে। রাজা মেনেস্-এর মধ্যে ফুটে উঠছে হোরাস্-এর শক্তি। প্রাচীন মিশরে রাজায়-দেবতায় গলায়-গলায় সম্পর্ক।

প্রাচীন মিশরের ইতিহাস শিখে কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন যুগটার কথাও নতুনভাবে ভাববার দরকার পড়ে গেলো। কেননা, প্রথমত দেখো, আমাদের দেশেও এতো যে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী এদের চেহারাতেও অনেক রকম জন্তুজানোয়ারের চিহ্ন। এই চিহ্নগুলো এলো কোথা থেকে? নিশ্চয়ই

আদিকালের টোটেম্-বিশ্বাস থেকে। গণেশঠাকুরের মাথাটা হাতির মতো কেন হলো, কিংবা, লক্ষ্মীর বাহন কেন পেঁচা হলো—এ-ধরনের প্রশ্ন তুমি এর আগে কখনো তুলেছো কি? এখন কিন্তু, আদিকালের টোটেম্-বিশ্বাস আর প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জেনে, তোমার পক্ষে এ-প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের প্রাচীন পুথিপত্রগুলো উলটে দেখলে দেখবে তার মধ্যে ভুরি-ভুরি জন্তুজানোয়ারের নাম। এ-ধরনের নামের আসল মানে কী সে-কথাও ভেবে দেখা দরকার। কিন্তু সে-সব কথা খানিক পরে তুলবো।

একটু আগেই বলছিলাম, যতোদিন পর্যন্ত টোটেম্-দল—দলের মধ্যে সব মানুষ সমানে-সমান—ততোদিন পর্যন্ত মানুষ পুজো করতে শেখেনি, প্রার্থনা করতে শেখেনি, শেখেনি দেবতার পায়ে মাথা কুটতে, মানত করতে। তার মানে, ততোদিন পর্যন্ত ধর্ম বলে কোনো কিছুর কথাই আসেনি মানুষের মাথায়। দেবতারই জন্ম হয়নি, ধর্মবিশ্বাস আসবে কোথা থেকে?

তার প্রমাণ? প্রমাণ দিতে পারি দুরকমের। এক: আজো সভ্য মানুষদের কোনো কোনো ব্যবহারের মধ্যে তার পরিচয় থেকে গিয়েছে। দুই: আজো যে-সব মানুষ পড়ে রয়েছে আদিম-অসভ্য অবস্থায় তাদের মনের বিশ্বাসটাকে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে এর মিল নেই।

অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা রইলে সাক্ষী

আমাদের বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মেয়েরা ব্রত করে। ব্রত বলে এই ব্যাপারটা আসলে কী তা একটু হুঁশিয়ার হয়ে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

ভালো করে নজর করলেই দেখতে পাবে, প্রত্যেক ব্রতর সঙ্গে কোনো-না-কোনো কামনার যোগাযোগ রয়েছে। অমুখ জিনিস চাই, তাই এই ব্রত করছি। এই কামনাটাই ব্রতর মধ্যে খুব বড়ো কথা।

একটা ব্রতর নাম ভাদুলি। কিসের কামনায় এই ভাদুলি ব্রত? আত্মীয়-স্বজন যাতে জলপথে, স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে তারই কামনা।

ব্রত করবার সময় আলপনা দিয়ে ছবি আঁকা হয়। ভাদুলি ব্রতর সময়ও ভাদুলিকে ঘিরে নানান রকমের ছবি। কিসের ছবি? নদী, সমুদ্র, কাঁটাবন, নানান রকম হিংস্র জন্তু, নৌকো, —কতো কি!

ছবি তো আঁকা হলো।

তারপর এক একটি ছবিতে ফুল ধরে মেয়েরা ছড়া কাটে। কিসের ছড়া? সেই আলপনা যে-কামনার প্রতিচ্ছবি তাই নিয়েই ছড়া। যেমন ধরো, নদীর আলপনায় ফুল ধরে মেয়েরা বললো:

নদী নদী কোথা যাও?
বাপভায়ের বার্তা দাও।

এই রকম ভিন্ন ভিন্ন আলপনায় ফুল ধরে, ছড়া কেটে, তবেই কিনা ভাদুলি ব্রত করা হয়।

কথা হলো, পুরো ব্যাপারটার মানে কী?

তুমি হয়তো বলবে, এ-নিয়ে আবার ভাববার কী থাকতে পারে? ভাদুলি বলে এক দেবতাকে ফুল দিয়ে পুজো করা হচ্ছে। ফুল পেয়ে ঠাকুর মনের কামনা পূরণ করবে— ঠাকুরের কৃপায় আত্মীয়স্বজন বিদেশ থেকে নিরাপদে ফিরে আসবে।

কিন্তু যাঁরা ব্রতর মানে নিয়ে ভালো করে ভেবে দেখেছেন, তাঁরা তোমার কথায় সায় দিতে পারবেন না। কেননা, তাঁরা যে দেখছেন, ব্রতর সঙ্গে পুজোর আকাশ-পাতাল তফাত।

পুজো মানে? ঠাকুরের পায়ে ফুল দিয়ে ঠাকুরের মনে করুণা জাগাবার চেষ্টা। ঠাকুর খুশি হয়ে আমার মনের কামনা পূরণ করে দেবেন।

ব্রত মানে কিন্তু মোটেই তা নয়। ব্রতের মধ্যে করুণা ভিক্ষে করবার চেষ্টা এতোটুকুও নেই। তার বদলে বরং একটা জোর-জুলুমেরই ভাব। আলপনা দিয়ে একটা নদী আঁকলাম, ছবিটার উপর ফুল ধরলাম, ছড়া কেটে মনের কামনা জানালাম। কিন্তু ভাবটা মোটেই এই নয় যে ফুল পেয়ে বা ছড়া শুনে নদীর প্রাণে করুণা জাগবে, পূর্ণ হবে আমার মনস্কামনা। তার বদলে, ভাবটা বরং এই যে নদী বাধ্য হবে ওই কামনা মানতে। ছড়া কেটে, ফুল ধরে, ছবি এঁকে, নদীকে বশ করা গিয়েছে।

আলপনা দিয়ে কাঁটাবন আর হিংস্র জন্তুজানোয়ারের ছবি আঁকলাম, ছড়া কেটে কামনা জানালাম, ফুল ধরলাম। ভাবটা কিন্তু মোটেই এই নয় যে ছড়া শুনে, ফুল পেয়ে কাঁটাবন আর হিংস্র জানোয়ার আমার উপর খুশি হয়ে যাবে, আমাকে দয়া করবে, আমার মনস্কামনা পূর্ণ করে দেবে। যদি তাই হতো তাহলে ব্রতর সঙ্গে পুজোর কোনো তফাত থাকতো না। কিন্তু ব্রতর বেলায় ভাবটা যে একেবারে অন্য রকমের। ছবি এঁকেছি, ছড়া বলেছি, ফুল ধরেছি : তাই কাঁটাবন আর হিংস্র জানোয়ার বশ হয়েছে, বাধ্য হয়েছে কামনাটা মানতে।

ব্রতর ফুল আর পুজোর ফুল এক নয়। ব্রতর বেলায় ফুলটা হলো সাক্ষী। নদীকে ছবি এঁকে ছড়া কেটে বশ করেছি। তার সাক্ষী ফুল। কাঁটাবনকে বশ করেছি। তার সাক্ষী ফুল। হিংস্র জন্তুজানোয়ারকে বশ করেছি। তার সাক্ষী ফুল।

বসুধারা ব্রতর বেলায় মেয়েরা সোজাসুজি বলে :

অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আটদিকে আট ফল আমরা রাখি।
অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আটদিকে আট ফুল আমরা রাখি॥

ব্রত আর পুজোয় তফাত।

ঠাকুরের পায়ে ফুল দেবার সময় এ-রকম সাক্ষী-সাবুদ রাখবার কথা ওঠে না। তার কারণ, ফুল দিয়েছি বলেই তো আর ঠাকুর আমার কথা মানতে বাধ্য নয়। সাক্ষী-

সাবুদের কথা ওঠে শুধু তখনই যখন কিনা বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন রয়েছে। তোমার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হলো, তুমি আমার হয়ে অমুখ কাজটা করে দিতে বাধ্য—সাক্ষী রইলো তমুক লোক। কিন্তু যেখানে ভিক্ষে চাওয়া, দয়ার দান চাওয়া, সেখানে আবার সাক্ষী-সাবুদের কথা উঠবে কেমন করে? তাই দেবতার পুজোর বেলায় সাক্ষী রাখবার মানে নেই। দেবতার দয়া হলে পর তিনি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। এখানে জোর নেই। শুধু চাওয়া। শুধু পায়ে মাথা কোটা। হাজার সাক্ষী মানলেও তো ঠাকুর আমাকে দয়া করতে বাধ্য হবে না।

ব্রতগুলোর আসল মানে কী, এ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালো করে ভেবে দেখছেন। আর তিনি বলছেন, ব্রতয় ফুল ধরা আর দেবতার পায়ে ফুল দিয়ে পুজো করা—এ দুয়ের মধ্যে তফাত রয়েছে।

অবনবাবু আরো বলেছেন, "এমনি শস্‌পাতার ব্রত। সেখানে আমরা দেখি মানুষ প্রচুর শস্যের কামনা করছে; কিন্তু সেই কামনা সফল করবার জন্যে সে যে নিচেষ্টভাবে কোনো দেবতার কাছে জোড়-হাতে 'দাও দাও' করেছে তা নয়; সে যে-ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফসল ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এমনি নানান ক্রিয়ায় প্রকাশ করছে। বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্‌পাতার ব্রত বা ভাঁজো, ভাদ্র মাসের মন্থনষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্তী শুক্লাদ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্থনষষ্ঠীর পূর্বদিন পঞ্চমী

তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য—মটর, মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা,—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়; পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে এবং ইদুরমাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়; দ্বাদশী পর্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার পাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ-বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্রদ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান। নিকানো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন-দেওয়া আলপনা; কোথাও মাটির ইন্দ্র-মূর্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন আপন শস্পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তারপর সাত-আট থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত ধরাধরি করে বেদীর চারিদিক ঘিরে নাচগান শুরু করে।....

ভাঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা
ভাঁজোর গলায় দেবো আমরা পঞ্চফুলের মালা।

এর পরে দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে মুখে ছড়া-কাটাকাটি করে।....সমস্ত রাত্রি দুই দলের নাচগান ছড়া-কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো তারার ঝিকমিক।"

মেয়েরা যতো নাচবে ভাঁজো ততোই কলকলিয়ে উঠবে। মটর, মুগ অড়হর কলাই, ছোলা,—বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারা। তারপর কামনা সফল হবার পালা: শস্য, প্রচুর শস্য।

ওই শস্যের কামনাতেই তো শস্‌পাতার ব্রত। তারই নাম ভাঁজো।

কেবল নজর রাখতে হবে, কামনা সফল করবার এই যে চেষ্টা এর মধ্যে কোথাও পুজো-পাঠের বালাই নেই। প্রার্থনা-উপাসনার চিহ্ন নেই।

ব্রতয়-পুজোয় আকাশ-পাতাল তফাত।

নাচ, গান, কাজ

তাহলে, ব্রতর আলোচনা থেকে আর এক নতুন সমস্যার মধ্যে গিয়ে পড়তে হলো : চাঁদের আলোয় মেয়েরা রাতভোর নাচছে, গান গাইছে, ছড়া কাটছে। আর তারা ভাবছে, কলকলিয়ে উঠবে ভাঁজো। অর্থাৎ কিনা অঙ্কুর বড়ো হয়ে গাছ হবে, পাওয়া যাবে প্রচুর শস্য।

এ আবার কোন ধরনের বিশ্বাস ? আমরা তো জানি, মানুষ আমোদ-আহ্লাদ করবার জন্যই নাচ-গান করে, ছড়া কাটে, পদ্য বলে। এ সবের সঙ্গে শস্য পাবার সম্পর্ক কী ?

আমাদের মনের একেলে ধারণা দিয়ে ব্যাপারটাকে সত্যিই বুঝতে পারবো না।

চলো, আর একবার বিদেশ ঘুরে আসা যাক। দেখা যাক, অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো মানুষের মনের বিশ্বাস দিয়ে বর্ধমানের মেয়েদের এই ব্রতটিকে বুঝতে পারা যায় কি না।

তুমি যদি মেক্সিকোয় যাও তাহলে একজাতের মানুষের সঙ্গে আলাপ হবে। তাদের নাম তারাহুমারে। তাদের কথাবার্তা

শুনতে শুনতে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কেননা, ওদের ভাষায় 'নাচা' আর 'কাজ করা' এ-দুয়ের মধ্যে তফাত নেই। ওরা বলে 'নোলাভোয়'—তার মানে, নাচা আর কাজ করা, দুইই।

দলের বুড়ো ছোকরাকে ঠেস দিয়ে বলে, নাচে যোগ না দিয়ে চুপ করে বসে রয়েছো কেন? অথচ, আমাদের ভাষায় বুড়ো আসলে বলতে চাইছে, কাজকর্ম না করে আলসেমি করছো কেন?

খোকা বড়ো হয়ে যুবক হলো। যুবক বড়ো হয়ে প্রবীণ হলো। আমরা কী বলি? বলি, বয়েস বাড়ছে। অথচ, ওরা কী বলবে জানো? বলবে, নাচ বাড়ছে বা নাচের সংখ্যা বাড়ছে। আর যার নাচের সংখ্যা যতো বেশি সমাজে তার খাতিরও ততো বেশি। তারপর বয়েস বাড়তে বাড়তে লোকটা যখন থুরথুরে বুড়ো হয়ে গেল তখন দেখলে সে কপাল চাপড়ে বলছে, দলের নাচেই যোগ দিতে পারি নে—বেঁচে আর লাভ কী! নাচতে না পারা আর কাজকর্ম করতে না পারা—দুইই এক! তাহলে, ওদের কাছে নাচ নেহাতই আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার নয়। তার সঙ্গে কাজকর্মের সোজাসুজি যোগাযোগ রয়েছে!

মেক্সিকো থেকে তুমি ইয়োরোপে ফিরে এলে। গেলে অষ্ট্রিয়া বা জার্ম্মানি! একজায়গায় দেখলে একদল চাষী শন বুনেছে আর তারা শুরু করেছে নাচ। সে কী নাচ! তুড়ি লাফ কেটে কেটে আকাশের দিকে কতোখানি উচুতে ওঠা সম্ভব তারই প্রাণপাত চেষ্টা! তুমি ওদের শুধোলে, এ-রকম নাচ নাচছো কেন? ওরা বলবে, তাও জানো না? আমরা যতোই উঁচু উঁচু লাফিয়ে

লাফিয়ে নাচবো আমাদের শনও যে ততোই উঁচু হবে, বড়ো হবে।

মেসিডোনিয়ায় গেলে। দেখলে, মাটি কুপিয়ে বীজ বোনবার পর চাষীর দল খেতের ওপর কোদাল-নাচ নাচতে লেগে গিয়েছে। কোদাল-নাচ কী রকম? কোদালগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ছে আর লুফে নিচ্ছে। ব্যাপার কী? ওরা বলবে, কোদালগুলো আকাশের দিকে যতো উঁচু উচু উঠবে শস্যের শিষও ততো উঁচু হবে যে!

তার মানে, নাচ বলতে আমরা যা বুঝি ওরা শুধু তাই বুঝছে না। কাজকর্মের সঙ্গে, জীবনধারণের সঙ্গে ওদের ধারণায় নাচের যোগ রয়েছে! কিন্তু এই ধারণাটার সঙ্গে আমাদের সাধারণ ধারণার এতো তফাত যে আমরা চট করে বুঝতে পারবো না। তাই চলো, আবার অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কাছেই ফিরে যাওয়া যাক। তাদের মধ্যে এই ধারণাটা আজো খুব স্পষ্টভাবে টেকে রয়েছে। তাই মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকেই।

হয়তো আকাশে বৃষ্টি নেই। বৃষ্টি না হলে সর্বনাশ। অসভ্য মানুষেরা এ-অবস্থায় কী করবে?

আকাশে জলের চিহ্ন নেই দেখে তারা ঘরের কোনায় হাত-পা গুটিয়ে বসে চোখের জলে ভাসবে নাকি? মোটেই নয়। তার বদলে ওরা একটা কিছু করতে চায়। কী করবে? তারা কি কোনো বৃষ্টির দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা জানাবে, 'হে ঠাকুর, বৃষ্টি দাও'? তাও নয়।

অসভ্য মানুষ অনেক কিছুই জানে না। যেমন, বৃষ্টি কেন হয়

তা জানে না, তেমনিই আবার পুজো করা কাকে বলে তাও জানে না। বৃষ্টি কেন হয় আমরা তা জানি। সেই জানার নাম হলো বিজ্ঞান। পুজো করা মানে কি তাও আমরা জানি। তার নাম ধর্ম। ওরা না-জানে বিজ্ঞান, না-জানে ধর্ম। ওদের মনের যে-বিশ্বাস তার নাম বিজ্ঞানও নয়, ধর্মও নয়।

ওরা করবে কি, দলের সবাইকে ডাক দিয়ে বলবে : এসো আমরা বৃষ্টির নাচ নাচি। বৃষ্টির নাচ আবার কী রকম ? সবাই মিলে আকাশের দিকে জলের ছিটে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বৃষ্টির একটা নকল তোলা, কিংবা, নকল এক বৃষ্টি সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে মেঘের ডাকের নকল করা, হয়তো বিদ্যুৎ চমকানোর নকল করাও। আরো কতো রকম। আর তারই সঙ্গে তালে তালে দল বেঁধে নাচ। নাচের ধরন-ধারনটা ভালো করে নজর করো। দেখবে, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছে। ভাবটা হলো, যা চেয়ে নাচ তা বুঝি সত্যিই পাওয়া গিয়েছে। বৃষ্টি চেয়েই নাচ। নাচবার সময় ওরা এমনই ভাবগতিক করছে যে সত্যিই বুঝি আকাশ কালো করে জল নামলো, মেঘ ডাকলো, বিদ্যুৎ চমকালো। বৃষ্টি এলো ঝেঁকে।

ওরা নাচছে আর ভাবছে, সত্যিই বুঝি এইভাবেই বৃষ্টিকে জয় করা গেলো। বৃষ্টি এবার হবেই হবে।

তার মানে, ওদের মনের ভাবগতিকটা কী রকম ? এক নকল বৃষ্টি সৃষ্টি করে, কিংবা, বৃষ্টি হবার অবস্থাটাকে নেচে নকল করে, ওরা ভাবলো আসল বৃষ্টিকেই বুঝি জয় করা গিয়েছে।

হয়তো শিকারে বেরুবে। হরিণ শিকার। ওরা করলো কি,

হরিণের এক ছবি আঁকলো আর ছবি এঁকেই হরিণটার গায়ে বিঁধিয়ে দিলো একটা তীর। তার মানে হরিণ-শিকার বলে পুরো ব্যাপারটারই যেন এক নকল করে নেওয়া। আর ওরা ভাবলো, এইভাবে ছবির হরিণের গায়ে ছবির বাণ মেরেই আসল হরিণের গায়ে আসল বাণ মারবার সমস্যাটাকে সহজ করে নেওয়া গিয়েছে।

ছবি আঁকবার বদলে ওরা অবশ্য দল বেঁধে নাচ জুড়ে দিতেও পারতো। সে কী নাচ, কী নাচ! শিকারের পোশাক পরে বর্শা হাতে বল্লম নিয়ে, তীরধনুক বাগিয়ে নাচ। এক কথায় পুরো নাচটাই হলো শিকারের নকল, বা, নকল শিকার। গারো, কিংবা নাগাদের শিকার-নাচ দেখো নি?

শিকারের নকল কেন? কেননা ওদের মনে মনে বিশ্বাস, এইভাবে নকল শিকারের সাহায্যেই আসল শিকারের আসল সমস্যাটাকে অনেকখানি চুকিয়ে নেওয়া যাবে।

হয়তো যুদ্ধে বেরুবে। মনের কামনাটা হলো যুদ্ধে জেতবার। তাই বলে কি ওরা যুদ্ধে বেরুবার আগে ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আশীর্বাদ চাইবে না কি? তা নয়। তার বদলে, যুদ্ধে বেরুবার আগে ওরা দল বেঁধে নাচ জুড়ে দেবে। নাচটা নজর করলে দেখবে: যেন ঘোর যুদ্ধ লেগে গিয়েছে, যুদ্ধে জিত হয়েছে—তারই নকল। ওদের মনে মনে বিশ্বাস, কামনা সফল হয়েছে এই কথাটি নকল করেই কামনাকে সত্যিকারের সফল করা যায়।

এই বিশ্বাসকে না পারো বলতে বিজ্ঞান, না ধর্ম। বিজ্ঞান

নয়, কেননা এর প্রায় পুরোটাই তো কল্পনা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তুলনায় নেহাতই আজগুবি ব্যাপার। ধর্ম নয়, কেননা এর সঙ্গে ঠাকুর-দেবতার কথা নেই, পুজো-উপাসনার সম্পর্ক নেই।

না-বিজ্ঞান না-ধর্ম এই যে মনের বিশ্বাস, এরই নাম দেওয়া হয় জাদু। ইংরেজিতে বলে ম্যাজিক। ম্যাজিক মানে কিন্তু এখানে চোখের ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে অবাক খেলা দেখিয়ে দেওয়া নয়। তার বদলে মানুষের ওই আদিম বিশ্বাস: নকলকে জয় করে আসলকেও জয় করবার বিশ্বাস। আমরা বাংলা করে এই অর্থেই জাদু বলে শব্দ ব্যবহার করবো।

তাহলে, প্রাচীন মানুষের কাছে নাচ গান ছবি ছড়া সব কিছুই রয়েছে একসঙ্গে জড়িয়ে। আর সব কিছুর পিছনেই সবচেয়ে বড়ো তাগিদতা হলো বাঁচবার তাগিদ। কাজের তাগিদ। যে বিশ্বাসটা দিয়ে এগুলি সবই একসঙ্গে বাঁধা রয়েছে তারই নাম জাদু।

আসলে, আমাদের জীবনে আজকাল বেঁচে থাকবার সমস্যাটা অনেকখানি সহজ হয়েছে। ক্ষিদে পেলে খাবার খাওয়া, শীত করলে গায়ে জামা দেওয়া, বৃষ্টি এলে ঘরে ঢোকা—এ সব ব্যাপার আমাদের পক্ষে কতো সহজ! কিন্তু বেচারা ওই প্রাচীন মানুষের দল! নেহাতই বাজে ধরনের হাতিয়ার নিয়ে তারা পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করছে। তাদের সম্বল খুবই সামান্য। আর তাই জন্যেই তাদের জীবনে নিছক বেঁচে থাকবার চেষ্টাটাই সবচেয়ে বড়ো চেষ্টা। সব কিছুকে

ছাপিয়ে উঠেছে এই চেষ্টা। এদিকে, ওদের জ্ঞান এতোই কম যে কিসের দরুন কী হয় তা ওদের কাছে মোটেই স্পষ্ট নয়। বৃষ্টির সময় ওরা মেঘের ডাক শুনেছে। আর শুধু এইটুকুই বুঝেছে যে বৃষ্টির সঙ্গে মেঘের ডাকের সম্বন্ধ আছে। ওরা ভাবছে, বৃষ্টির নাচ নাচবার সময় মেঘের ডাকের নকল করতে পারলেই হলো। তারই টানে আসবে বৃষ্টি। ওরা তাই মেঘের ডাকের নকল করছে আর ভাবছে : বৃষ্টি এলো ঝেঁকে!

বাংলার ব্রত

"মেক্সিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপুজায় মেয়েরা এলোকেশী হয়—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা গোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই আশায়"।

এর পেছনেও ওই আদিম বিশ্বাস। জাদু। নকলে-আসলে তফাতটা অতো স্পষ্ট হচ্ছে না। নকল দিয়ে আসলটাকে জয় করবার কল্পনা।

আর এতোক্ষণে জাদু-বিশ্বাসের এই রহস্যটুকু বুঝে, বাংলার ব্রতগুলোর একটা মানে ঠাহর করা সম্ভব হবে।

আলপনায় নদীর নকল তুললাম। ছড়া কেটে জানালাম মনের কামনা। সাক্ষী রইলো ফুল। নদীর নকলকে বশ করে মনে করছি নদী আমার বশ হয়েছে। তাই মনের কামনা পূরণ হবে।

কাঁটাবনের ছবি এঁকে, হিংস্র জানোয়ারের আলপনা দিয়ে,

ছড়া কেটে, ফুল সাক্ষী রেখে কাঁটাবন আর হিংস্র জানোয়ারকেও বশ করবার কল্পনা।

আলপনায় গোলাভরা ধানের নকল তুললাম। ছড়া কেটে বললাম মনের কামনা। ধানের গোলা এবার ভরে উঠবে।

জাদু-বিশ্বাস ছাড়া আর কী? আর জাদু বলেই পুজো নয়, বিজ্ঞানও নয়। পুজোই হতো, যদি কোনো ঠাকুরের কৃপায় ধানের গোলা ভরিয়ে তুলতে চাইতাম। বিজ্ঞানই হতো যদি আসল ধান বুনে আসল গোলাটা আসলে ভরিয়ে তুলতাম। কিন্তু জাদুর আগাগোড়াই যে কল্পনা, আগাগোড়াই যে আজগুবি ধারণা।

ধর্ম, বিজ্ঞান, জাদু

কিন্তু এইখানে একটা বড়ো মজার ব্যাপার আছে। জাদু-বিশ্বাসের আগাগোড়াই যদিও কিনা আজগুবি, জাদুর আগাগোড়াই যদিও কিনা কল্পনা বা ভুল ধারণা, তবুও এই জাদুই প্রাচীন মানুষকে বাস্তবিকই বাঁচবার ব্যাপারে সাহায্য করছে।

শুনতে প্রথম ঝোঁকে অবাক লাগবে। কিন্তু নানান ব্যাপার রয়েছে। সেইগুলো ভেবে দেখা দরকার।

ব্রতর কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। ব্রতর সূত্র ধরেই এগুবার চেষ্টা করা যাক।

যেগুলো কিনা খাঁটি আর পুরোনো ব্রত সেগুলোর একটা মজা হচ্ছে একা-একা তা করা যায় না। ব্রতটা করতে হয় অনেকে মিলে, একসঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "একজন

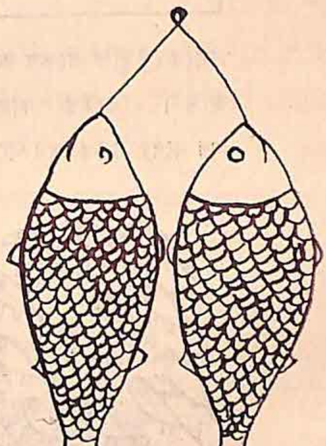
মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্যে ক্রিয়া ; কিন্তু ব্রত তখন যখন দশে মিলে এক কাজ এক উদ্দেশে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হল—একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠছে”।

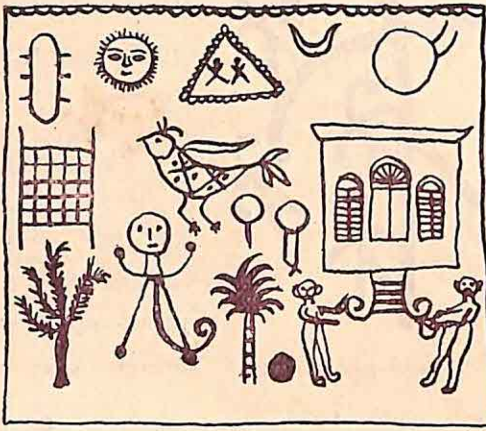
কিন্তু ব্যাপার কি ? একা-একা করলে সেটা ব্রত হবে না কেন ? ব্রত কেন একসঙ্গে দল বেঁধে করবার কথা ?

তার কারণ হলো, ব্রত আসলে আজকের জীবনের ব্যাপারই নয়। প্রাচীন যুগের প্রাচীন সমাজের এক ব্যাপার। যা-কিনা আজো আমাদের দেশে ঢেঁকে রয়েছে। আর, আগেই বলেছি, আদ্যিকালের মানুষ মোটেই একা-একা বাঁচবার চেষ্টা করেনি। দল বেঁধে, একসঙ্গে এক হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে। তাদের কাছে তাই পুরো দলের জীবনটা বাদ দিয়ে একার জীবন বলতে, সত্যিই কিছু নেই। দলের জীবনটাই আসল জীবন। দলটা এক, অখণ্ড, পুরো কিছু। তার মানে, দশজন মানুষ যে আলগোছে একজায়গায় একত্র হয়েছে তা নয়। তাহলে ঝোঁকটা হতো আলাদা-আলাদা মানুষগুলোর উপর। আমাদের শরীরের বেলায় পাঁচটা অঙ্গকে আলগোছে একজায়গায় জড়ো করে দিলেই একটা পুরো মানুষ হয় না ; কেননা, পুরো মানুষটাই বড়ো কথা, আসল কথা। অঙ্গগুলো তারই অঙ্গ। অর্থাৎ কিনা, ঝোঁকটা আলাদা আলাদা অঙ্গর ওপর নয়, পুরো মানুষটারই ওপর। সেই রকম আদ্যিকালের মানুষের বেলায় আসল ঝোঁকটা পুরো দলের ওপর, আলাদা আলাদা

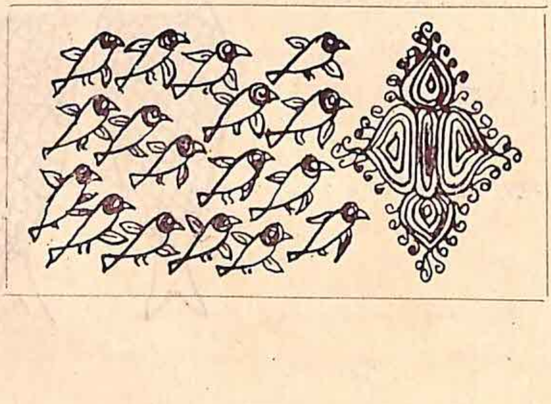


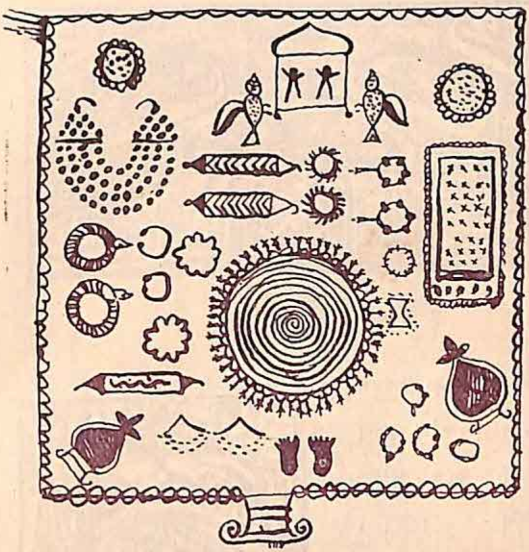
হাতে-পো কাঁখে-পো। বাংলা দেশের মেয়েরা পুত্রের কামনায় ব্রত করে। পুত্র লাভ হলো অনেক, কোল-কাঁখ ভরে উঠলো—আলপনায় এই কথা-টিকে নকল করে মনে-মনে কল্পনা করা হলো সত্যিই বুঝি পুত্র লাভ হবে। তেমনি আবার জোড়া-রুই এঁকে, মনের কামনা জানিয়েই কল্পনা করা হচ্ছে মনের কামনা সফল হবে। খাঁটি পুরোনো যে-সব ব্রত তার বেলায় নজর রাখতে হবে: পুজো করা, ঠাকুর-দেবতার পায়ে মাথা কোটা—এর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ব্রতকে তাই ধর্ম বলা চলবে না। বললে ভুল হবে। তাহলে কী বলবো? এর পেছনে আছে আসলে জাদুতে বিশ্বাস।





ওপরে সেঁজুতি ব্রতের আলপনা। নিচে সুবচনীর হাঁস। কিসের কামনা এই-জাতীয় ব্রতে? এর মধ্যে ঠাকুর-দেবতাকে কোথাও খুঁজে পাও?





বসনভূষণ চেয়ে ওপরের আলপনা। তারই ছবি ফলাও করে আঁকা হয়েছে। পরের যুগের লোক ভেবেছে, লক্ষ্মী-নারায়ণ বলে দুজন ঠাকুরকেও এই ছবিতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সেটা খুব সম্ভব পরের যুগের কল্পনা। আগের যুগের কল্পনার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। নিচের ছবিতে মেক্সিকোর আলপনা।

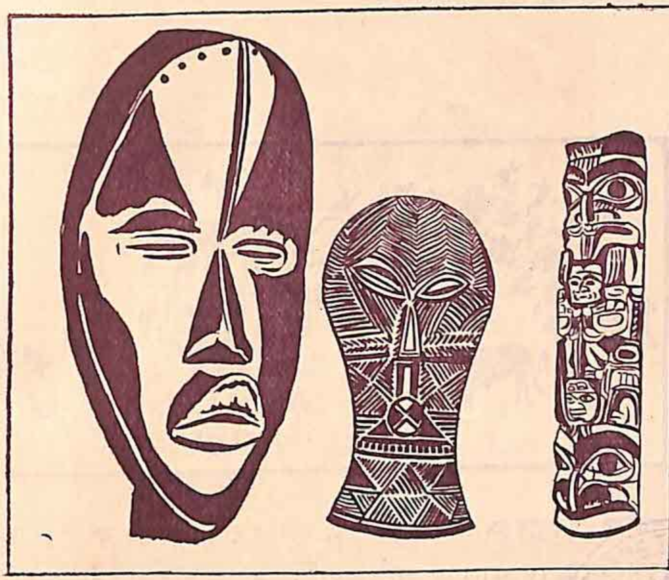




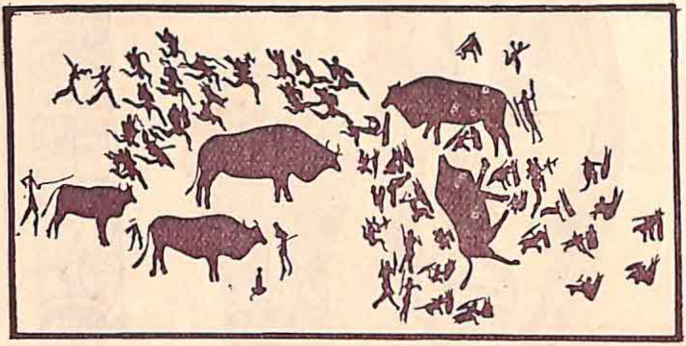
আলপনা শুধুই বাংলা দেশে নয়। মেক্সিকোর আলপনা দেখো। পুরীর জগন্নাথের সঙ্গে কোথায় যেন মিল রয়েছে বলে মনে হয় না ?



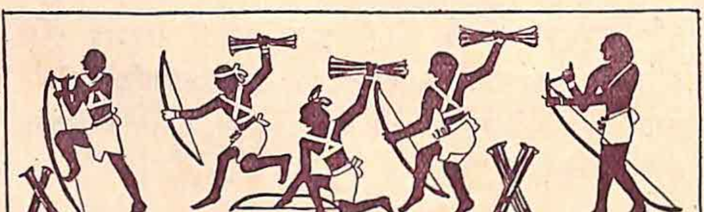


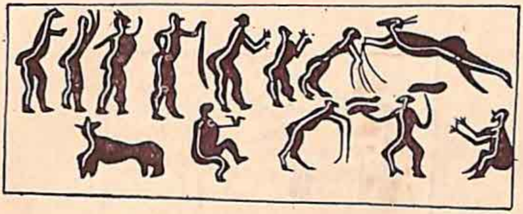


বাঁ-দিকে আর মাঝখানে আফ্রিকার অদিবাসীদের তৈরি মুখোস। ডানদিকে বাড়ির খোদাই-করা থাম। কথা হলো, এ-ধরনের মূর্তি গড়বার তাগিদটা কী? পুজো করা? ঠাকুরের মূর্তি বানানো? তা নয়। আদিবাসীদের মনের ভাবগতিক যাঁরা ভালো করে পরীক্ষা করেছেন তাঁরাই বলছেন, আসল উৎসাহটা জাদু-বিশ্বাসের।

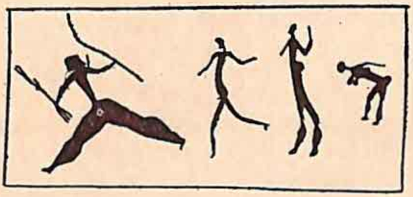


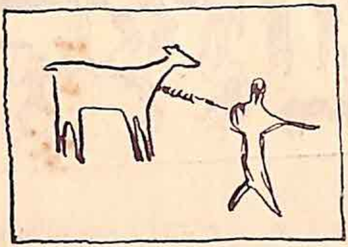
শিকারে বেরুবার আগে নেচে কিংবা ছবি এঁকে শিকারে সফল হবার নকল করে নেওয়া। তাতে নাকি আসল শিকারের আসল সমস্যাটা হালকা হয়ে যায়। ওপরের ছবিটা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের আঁকা, নিচেরটা প্রাচীন মিশরের এক মন্দিরের গায়ে আঁকা।



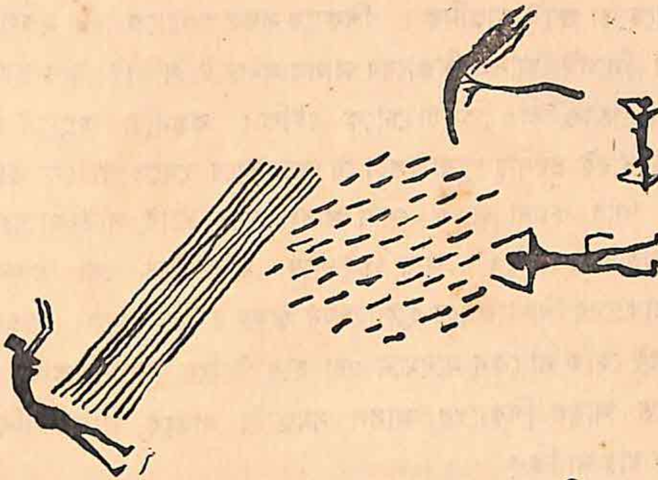


দল বেঁধে তালে তালে নাচা। কেন নাচা? জাছ-বিশ্বাস। মনে রেখো, জাছ-বিশ্বাস মানে ধর্মও নয়, বিজ্ঞানও নয়। বিজ্ঞান বলছে, সত্যিকারের পৃথিবীর সত্যিকারের নিয়মকান্থন আবিষ্কার করে পৃথিবীটাকে সত্যিই জয় করবো। ধর্ম বলছে, দেবতার পায়ে মাথা কুটবো। জাছ-বিশ্বাস কী বলছে? শিকারে সফল হওয়াকে নেচে নকল করলাম, অতএব সফল হবোই হবো। আজগুবি কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু এই আজগুবিটুকু না হলে তখনকার মান্থষের পক্ষে বাঁচাই দায় হতো।





জাদু-বিশ্বাস। বিশ্বাসটা
ঠিক কী রকম? নকলকে বশ করে
আসলকে বশ করবার কল্পনা। ওপরের ছবিটায়
এ-কল্পনা কতো স্পষ্ট! ছবিটা পাওয়া গেলো কোথা থেকে?
ভারতবর্ষেরই এক গুহা থেকে। হোসেঙ্গাবাদ অঞ্চলে সেই গুহা।



বৃষ্টি চেয়ে জাদু। আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্র।

মানুষগুলোর ওপর নয়।

ব্রতকে বুঝতে হলে, জাদু-বিশ্বাসের রহস্য জানতে গেলে, এই কথাটি স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, দশজনে মিলে একই সঙ্গে একই কাজ করছে, একই কথা ভাবছে।

তাদের চোখের সামনে দুলছে কামনা সফল হবার ছবি। একের সামনে নয়। একার সামনে নয়। দশজন এক হয়েছে। একই কথা ভাবছে। একই ছবি দেখছে। দেখতে দেখতে মেতে উঠছে পুরো দলটা।

দলের মাতন—সে কি যেমন-তেমন নাকি?

এ-কথা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, যে-ছবি দেখে ওরা অমনভাবে মেতে উঠলো তা আগাগোড়াই আজগুবি। ওরা যা

ভাবছে তা শুধুই কাল্পনিক। শিকারে সফল হওয়াকে নেচে নকল করে নিলেই আসল শিকারের আসল সমস্যাটা সত্যিই চোকবার নয়। তবুও, তাও কিছুটা চোকে বইকি। কল্পনাটা কল্পনাই। কিন্তু তারই ভরসায় পুরো দলটা যে অমনভাবে মেতে ওঠলো তা তো আর কল্পনা নয়। সেটা আসল মেতে ওঠাই, সত্যিকারের উৎসাহ-উদ্দীপনাই। আর এইভাবে মেতে উঠে ওরা যখন সত্যিকারের শিকারে বের হলো তখন ওদের হাতিয়ারগুলো যতো দুর্বলই হোক না কেন মনেমনে ওরা হয়ে উঠেছে দুর্বার শিকারী। তাতে আসল শিকারের আসল সমস্যাটা সত্যিই অনেকখানি চুকে যায় না কি?

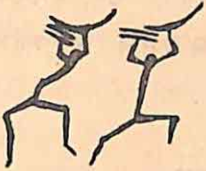
কিংবা ধরো, আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। ওরা যদি সত্যিই জানতো যে মেঘের ওপর ওদের দখলটা এমনই নগণ্য যে হাজার মাথা কুটেও ওরা রুক্ষ আকাশে এক ফোঁটা জল আনতে পারবে না—তাহলে তো ওদের বুক ভয়ে হিম হয়ে যাবার কথা!

বাঁচতে হলে মনে মনে আশা-ভরসাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সে-আশা ওরা পেয়েছে ওদের ওই জাদু-বিশ্বাসটির কাছ থেকে। ওরা বাঁচতে পেরেছে সাহসে বুক বেঁধে।

বসুধারা ব্রতটি দেখো। বাংলাদেশের মেয়েরা জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ব্রত করে। তখন আকাশের চেহারাটা কী রকম?

কালবৈশাখী আগুন ঝরে।
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকুশুকু, আকাশে ছাই!

আকাশের চেহারা যখন এ-হেন রোদ-ঝলসানো, পুড়ে-খাক-



বাঁ দিকে নাচ ও ডান দিকে বৃষ্টি-জাদু—আদিম মানুষেরই আঁকা দুটি ছবি।



হয়ে-যাওয়া, তখন যদি মনের ভরসাকেও শুকিয়ে যেতে না দাও তাহলে আষাঢ়ের জলধারার ছবিটা মনেরমধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বসুধারা ব্রত বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে সেই ছবিটিকেই। পুরো জ্যৈষ্ঠ মাস ধরে চলবে এই ব্রত। ব্রতটিকে যদি খুঁটিয়ে দেখো তাহলে দেখবে কল্পনায় শুধু জল আর জল—ঘন কালো মেঘ, দিগন্ত পর্যন্ত জলে থইথই করছে, আর শ্যামল শস্যে অপরূপ হয়ে উঠছে ভিজে মাটি।

কল্পনা নিশ্চয়ই। আগাগোড়াই তো কল্পনা। সে-কথা কি আর বলে দিতে হবে? তবুও এ-অবস্থায় ওই কল্পনাটুকুর দামই বা কম কিসের? সারা জ্যৈষ্ঠ মাস ধরে আকাশ যখন পুড়ে খাক তখন আষাঢ়ের ওই ভিজে ছবিটা মনে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে আষাঢ়ের অপেক্ষাটা অসহ্য হয়ে উঠবে না?

ফসল ফলতে সময় লাগে। মনে রাখতে হবে, ব্রতগুলির জন্ম এমন যুগে যখন কিনা ফসল ফলাবার কৌশলটা সবে মানুষের আয়ত্তে এসেছে। এ-কাজ তখন কী দুরূহ, কী কঠিন! তাই ধৈর্য চাই, মনের শক্তি চাই। শস্য বোনবার দিনটি থেকে শস্য পাবার দিনটি পর্যন্ত তো আর বড়ো কম সময় নয়! এই সময়টা ধরে মনের শক্তি চাই। কোথা থেকে তা পাওয়া যাবে? জাদু-বিশ্বাস থেকে।

জাদু-বিশ্বাস তো আগাগোড়াই আজগুবি। তবু, মানুষের যখন আধা-অসহায় অবস্থা তখন ওই আজগুবি বিশ্বাসটাও একেবারে অনর্থক নয়।

প্রকৃতি বশ হলো মানুষের

কিন্তু কী আশ্চর্য জীব এই মানুষ! শুরুর দিকে তার অবস্থাটা অমন অসহায় হলেও প্রকৃতির কাছে দয়ার দান চেয়ে, শুধু হাত পেতে, সে বসে থাকে নি। বরং ওই হাত দিয়েই সে বানিয়ে নিলো হাতিয়ার, আর সেই হাতিয়ার হাতে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলো। লড়াইতে যেখানে পারছে না সেখানটায় কল্পনা করে নিচ্ছে। তবু হাল ছাড়ছে না। আর হাল ছাড়ছে না বলেই, শুধুমাত্র কল্পনার ওপর নির্ভর করে সারাটা কাল তাকে বসে থাকতেও হচ্ছে না। লড়াইতে তার জিত হয়ে চললো একের পর এক, দিনের পর দিন ধারালো আর দুর্বার হয়ে উঠতে লাগলো তার হাতিয়ার।

কোথা থেকে মানুষ শুরু করেছিলো? সে-এক অস্পষ্ট অতীতের কথা। শুরুর মানুষ এখান-ওখান থেকে দু-চারটে পাথ-রের টুকরো কুড়িয়ে নিয়েছিলো, সেই তার প্রথম হাতিয়ার। তাই দিয়ে কোনোমতে ফলমূল জোগাড় করবার চেষ্টা করা যায়। বাঁচবার রসদ বলতে তখন তার সেইটুকুই। তারপর মানুষ শিখলো ওই পাথরের টুকরোগুলোকেই ভালো করে শানিয়ে নিতে। বর্শা বানালো। বল্লম বানালো। বানালো তীরধনুক। সম্ভব হলো শিকার করতে পারা। সহজ হলো বাঁচবার সমস্যা। তারপর

মানুষ পাথর ছেড়ে, ধাতুর ব্যবহার শিখলো। শক্তি বাড়লো আরো অনেকখানি। বশ হলো বনের পশু। আর, মানুষ শিখলো পৃথিবীর বুক চিরে বীজ ছড়িয়ে পৃথিবীকে দিয়েই ফসল ফলিয়ে নিতে।

পৃথিবী মানুষের বশ হলো। শেষ পর্যন্ত মানুষ ঘরে তুলতে লাগলো রাশি-রাশি ফসল। সে যে কীরকম রাশিরাশি ফসল তার সাক্ষী পৃথিবীতে আজো টেঁকে রয়েছে। মিশরের পিরামিড, ঝামা ইটের পাঁচিল-ঘেরা হরপ্পা আর মোহেনজোদারো শহর— আরো কতো সাক্ষী!

কী রকম সাক্ষী? শোনো সেই কথা। হরপ্পার কথাই বলি। মুলতান থেকে লাহোর পর্যন্ত রেললাইন পাতবার ভার পড়েছিলো ব্রান্‌টন্‌-সাহেবের ওপর। রেললাইন পাতবার কাজে ঝামা ইট জোগাড় করতে পারলে খুব সুবিধে হয়, ইট বিছিয়ে তার ওপর লাইন পাতা যায়। ব্রান্‌টন্‌ খবর পেলো, কাছাকাছি এক পোড়ো শহর রয়েছে, সেখান থেকে ঝামা ইট জোগাড় করা যায়। ব্রান্‌টন্‌ জানতো না এই পোড়ো শহরটাই আসলে হলো প্রাচীন হরপ্পা। রেললাইন পাতবার জন্যে লুট হলো হরপ্পার ইট, সেই ইট বিছিয়েই পাতা হলো একশো মাইল রেলপথ। আজো তোমার ট্রেন যখন মুলতান থেকে লাহোরের দিকে ছোটে তখন তার চাকার তলায় মড়মড় করে ওঠে চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার মানুষদের হাতে তৈরি ঝামা ইট।

একশো মাইল রেল-লাইন পাতবার জন্যে কতো ইট লাগে? ওই অতো ইট জোগাড় হয়েছে হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে। তবুও

হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ ফুরিয়ে যায় নি। তাহলে ভেবে দেখো, হরপ্পা শহরের যখন কিনা সরগরম দিন তখন সেখানে কতো ইট ছিলো!

কতো ইট লেগেছিলো শহরটিকে গড়বার জন্যে? কিন্তু ইট তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবেই কিনা ইট গড়তে হয়। তার মানে, ইট গড়বার জন্যে মানুষকে মেহনত করতে হয়: মাটি কেটে, ছাঁচে ফেলে, পাঁজায় পুড়িয়ে ইট গড়তে পারা যায়। তাছাড়া, শুধু ইট তৈরি করলেই তো আর হরপ্পার মতো একটা শহর গড়া যায় না! আরো হাজারো রকম কাজ করবার দরকার।

তাহলে সাদামাটা হিসেব করলেই বুঝতে পারবে অনেক হাজার মানুষের রক্ত-জল-করা শ্রম লেগেছিলো এই শহরটিকে গড়ে তোলবার জন্যে। আর তাই, এ-শহর যেন সাক্ষী দিয়ে বলছে: মানুষ ফসল ফলাতে শিখেছে রাশি-রাশি! কেননা ওই যে হাজার-হাজার মানুষ এতোবড়ো একটা কাণ্ড করে বসলো—ওদের খাওয়া-পরার জোগান দিতে হয়েছিলো তো! ওরা নিজেরা ফসল ফলায় নি। সে-দায়িত্ব ঘাড়ের ওপর থাকলে অমন একটা শহর আর গড়তে হতো না। তার মানে, অন্যেরা ফসল ফলিয়েছে। কিন্তু অন্যদেরও তো খেতে হয়েছে, বাঁচতে হয়েছে। তাহলে যারা ফসল ফলাচ্ছে, তারা মোট কতোখানি ফসল ফলাচ্ছে তা একবার ভেবে দেখো! ফসল থেকে নিজেদের বাঁচাচ্ছে, তাছাড়াও রাশিরাশি ফসল বাকি পড়ে থাকছে—কেননা এই বাকি ফসলটা থেকেই জোগান দেওয়া হচ্ছে হাজার-হাজার শ্রমিক আর কারিগরের খাবার।

প্রাচীন মিশরের ওই পিরামিডটার সাক্ষীও একই রকম। কয়েক লক্ষ মানুষ অনেক বছর একটানা পরিশ্রম করে গড়তে পারলো এই পিরামিড। তারা নিজেরা ফসল ফলায় নি। তাদের জন্যে খাবারের জোগান এলো অন্যের তৈরি ফসল থেকে। কিন্তু এই অন্যেরা—যারা কিনা ফসল তৈরি করেছে,—তাদের নিজেদের পক্ষেও তো বাঁচা দরকার। তাই খাওয়াও দরকার। তার মানে, তাদের তৈরি ফসল থেকে তারা নিজেদের বাঁচিয়েছে আর ওই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কারিগরের জন্যেও খাবার জুগিয়েছে। শ্রমিক আর কারিগরদের তারা বাঁচালো নিজেদের তৈরি ফসলের বাড়তি অংশটা দিয়ে।



নাচ : আদিম মানুষের আঁকা

ফসলের বাড়তি অংশ দিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আর কারিগরকে বাঁচাতে পারা কি কম কথা? তাহলে, ফসলের মোট পরিমাণটা কী বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে তা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারো।

তাই বলছিলাম, প্রাচীন সভ্যতার এই কীর্তিগুলি সাক্ষী দিয়ে বলছে : প্রকৃতি বশ হয়েছে মানুষের।

মন্ত্রশক্তি আর মন্ত্রগুপ্তি

কিন্তু প্রকৃতিই যদি মানুষের বশ হয় তাহলে কি আর জাদু-বিশ্বাসের কোনো দরকার থাকে নাকি? যতোদিন পর্যন্ত প্রকৃতির সামনে মানুষের প্রায় নিতান্ত অসহায় অবস্থা ততোদিন

না হয় জাদু-বিশ্বাসের একটা চাহিদা থাকতে পারে : প্রকৃতিকে জয় করবার কল্পনা থেকে সাহস পেয়ে প্রকৃতিকে সত্যিই বশ করবার পথে এগুবার চাহিদা। কিন্তু মানুষ যখন প্রকৃতিকে সত্যিই অতোখানি বশ করতে পেরেছে তখন আর ওই সাহসটুকুর দরকার কী ?

তাহলে প্রকৃতিকে বশ করতে পারবার পর মানুষের মন থেকে কি জাদুবিশ্বাস বলে ওই আজব-বিশ্বাসটা মুছে যেতে লাগলো নাকি ?

তাও নয়। আর সেইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। জাদু-বিশ্বাস রইলো টেকে। কেবল তার জাত বদলালো। উদ্দেশ্য বদলালো।

তার মানে ? তাহলে শোনো, খুলেই বলি।

আগে শুধু একটাই সমস্যা ছিলো : প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। এবার থেকে আর একটা নতুন সমস্যা দেখা দিলো : মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। আর জাদু-বিশ্বাস বলে ওই আজগুবি বিশ্বাসটা যে টেকে রইলো তা এই নতুন ধরনের সংগ্রামের খাতিরেই। কিন্তু এই নতুন ধরনের সংগ্রামের খাতিরে নতুনভাবে টেঁকতে গিয়ে জাদু-বিশ্বাসটার জাত বদলে গেলো। জাদু-বিশাস আর জাদু-বিশ্বাস রইলো না। হয়ে গেলো ধর্মবিশ্বাস।

ব্যাপারটাকে ঠিকমতো বুঝতে হলে, অনেক কথাই জানতে হবে।

প্রথমত, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম মানে কী ? আদিম মানুষ থাকতো দল বেঁধে, এক হয়ে। দলের মধ্যে সবাই সমান।

সবাই যেন এক। দলের সব মানুষ এক হয়ে প্রাণপাত খেটে প্রকৃতির কাছ থেকে যেটুকু খোরাক জোগাড় করতে পারতো তাই দিয়ে দলের সবাই কোনোমতে কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচে থাকতো। কিন্তু প্রকৃতি যখন মানুষের হাতে বেশ খানিকটা বশ হলো তখন অবস্থাটা অন্য রকম। প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ তখন অনেক বেশি খোরাক জোগাড় করতে শিখেছে। আর তাই একজনের পক্ষে, বা কয়েকজনের পক্ষে বাকি সবাইকার খাটুনির বাড়তি ফল-টাকে নিজের ভাঁড়ারে তুলে আনা সম্ভবপর হলো। আর হলোও তাই : অনেকখানি এলাকা জুড়ে অনেক মানুষ যে-ফসল ফলালো তারই একটা অংশ গিয়ে জমতে লাগলো রাজার ভাঁড়ারে। এর আগে পর্যন্ত এমন সম্ভাবনা মোটেই ছিলো না ; কেননা খাটুনির বাড়তি ফল বলেই কিছু ছিলো না—প্রাণপাত চেষ্টা করে মানুষ যেটুকু পেতো তাই দিয়ে কোনোমতে টায়ে-টুয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারতো।

তাহলে, প্রকৃতিকে অনেক বেশি করে বশ করতে পারার দরুনই মানুষের জীবনে একটা দারুণ পরিবর্তন দেখা দিলো। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আর সমানে-সমান সম্পর্ক রইলো না। মানুষের সমাজটা স্পষ্ট দুভাগে ভাগ হয়ে যেতে লাগলো। একদিকে অজস্র মানুষ—যারা খাটছে। আর একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষ—যারা অপরের খাটুনির বাড়তি ফলটাকে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। অপরের খাটুনি দিয়ে তৈরি জিনিসটাকে আত্মসাৎ করে নেবার নামই হলো শোষণ। তাই, ছোট্ট করে বললে বলতে পারো, মানুষের সমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে গেলো। একদিকে

শোষক আর একদিকে শোষিত। আর, তাই জন্যেই বলা হচ্ছে, মানুষের জীবনে এই সময় থেকে এক নতুন সমস্যা দেখা দিলো : এর আগে পর্যন্ত ছিলো শুধুই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। এখন থেকে শুরু হলো মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম।

কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম নিয়ে এই নতুন সমস্যা-টির খাতিরে ওই আদিম জাদু-বিশ্বাসটাকেই নতুন রূপে টেঁকিয়ে রাখবার দরকার পড়বে কেন? তার কারণ ওই যে অল্প কজন মানুষ,—যারা কিনা বাকি সকলের খাটুনির বাড়তি ফলটুকু নিজে-দের ভাঁড়ারে তুলবে,—তাদের পক্ষে বাকি সবাইকে তাঁবে রাখা দরকার। তাঁবে রাখবার কাজে আদিম জাদু-বিশ্বাসটাকেই নতুন রূপে টেঁকিয়ে রাখতে পারলে সুবিধে আছে। কেন, দেখো।

বাকি সবাই তো আর মুখ বুঁজে নিজেদের তৈরি বাড়তি ফসলটা অপরের ভাঁড়ারে তুলে দিতে যাবে না। হাসি মুখে দেবে না। ভয়ের চোটে দেবে। ভক্তিভরে দেবে।

তাই বাকি সবাইকে তাঁবে রাখবার জন্যে দরকার পড়লো বাকি সবাইকার মনে ভয়-ভক্তি জাগিয়ে রাখবার।

কাকে দেখে ভয় হবে? ভক্তি হবে? যার কিনা প্রচণ্ড শক্তি আছে। কিসের শক্তি? মন্ত্রশক্তি। আর সে কি যেসে-তেসে শক্তি নাকি? তারই দরুন নদীতে বান ডাকে, তারই দাপটে আকাশে সূর্য নিভে যায়, বেঁচে ওঠে।

এ আবার কোন ধরনের কথা? আসলে মিশরের কথা বলছি। থেকে থেকে হঠাৎ মিশরের কথা কেন? কেননা, আদিম অবস্থার পুরো দলটির জাদু-বিশ্বাস বদলে কেমন করে মাত্র

একজনের মন্ত্রশক্তিতে পরিণত হলো, তার ইতিহাস প্রাচীন মিশরের বেলায় মোটামুটি স্পষ্টভাবেই জানা গিয়েছে। যে-সব দেশের বেলায় এখনো এ-ইতিহাস ভালো করে জানা যায় নি সে-সব দেশের কথা অনুসন্ধান করতে হবে মিশরের কাছ থেকে পাওয়া মূলসূত্র অনুসরণ করেই।

প্রাচীন মিশরের কথা বলি।

নীল নদের বন্যার জলের ওপরেই পুরো দেশটার সুখদুঃখ নির্ভর করছে। সেদিক থেকে প্রাচীন মিশরের যেটুকু ঐশ্বর্য তার প্রায় সবটাই ওই নীল নদের অবদান। এ-হেন নীল নদে প্রতি বছর ঠিক একটা বাঁধাধরা সময়ে বান ডাকে। কেন ডাকে? আসল কারণটার কথা আমরা জানি। আমরা জানি, গরমকালে সূর্যের তেজে দূর-পাহাড়ের চুড়োয় বরফ গলতে শুরু করে আর ওই বরফগলা জলই ভাসিয়ে দিয়ে যায় নীল নদের একূল-ওকূল। আমরা জানি, সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদ এসে পড়ে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে আর তাই সূর্য পড়ে আমাদের চোখের আড়ালে। আমাদের পক্ষে এই যে জানা—এরই নাম বিজ্ঞান। প্রাচীন মিশরের মানুষ কিন্তু এতো কথা জানতে পারে নি। তখনো জন্ম হয় নি বিজ্ঞানের। কেবল ওদের মধ্যে এক-আধজন এই-টুকুই জানতে পেরেছিলো, বছরের কোন সময়টায় নীল নদের বুকে বন্যা আসবে! কী করে জানলো? আকাশের তারা দেখে সে শিখেছিলো বছরের হিসেব করতে, আর তাই শিখেছিলো বছরের নির্দিষ্ট দিনটিকে চিনতে—যে-দিন আসবে বন্যা।

বন্যা আসবার আগে সে মন্ত্র পড়ে দেয়। নীল নদের দুকূল

ছাপিয়ে বন্যা আসে। লোকে ভাবে, বন্যা এলো তার ওই মন্ত্রশক্তিতেই। মানুষটা তাহলে যেসে-তেসে নয়।

কিংবা হয়তো, সূর্যগ্রহণের আগে সে মন্ত্র পড়ে দেয়। নিভে যায় আকাশের সূর্য। সূর্যগ্রহণ ছাড়বার আগে সে মন্ত্র পড়ে দেয়। কেটে যায় সূর্যগ্রহণ। লোকে ভাবে, সূর্যের মরা-বাঁচা সবই বুঝি ওর মন্ত্রশক্তিতে ঘটছে। আর যদি তাই হয় তাহলে মানুষটা তো যেসে-তেসে নয়!

মন্ত্রশক্তি! ব্যাপারটা যে আসলে কী, তা আমরা বুঝতে পারছি। কী ব্যাপার? আজগুবি ব্যাপারই। জাদু- বিশ্বাসের মতোই আজগুবি, অসম্ভব, কল্পনা। আজগুবি কেন? কেননা, নদীতে বন্যা আসার বা আকাশে সূর্য নিভে যাওয়ার পেছনে বাঁধাধরা নিয়ম আছে—সে-নিয়ম প্রকৃতিরই নিয়ম, আর প্রকৃতির নিয়ম বলেই তা মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা করে না। সূর্যের তেজে পাহাড়ের চুড়োয় যদি বরফ গলে তাহলে নীল নদে বান ডাকবেই। সত্যিই তো আর মন্ত্র-পড়ার ওপর তা নির্ভর করছে না। তাই, মন্ত্রশক্তিতে এই বিশ্বাসটাও সম্পূর্ণ আজগুবি। জাদু-বিশ্বাসের মতোই নেহাত এক কল্পনা। তবু, কল্পনা হলেও, কী দাপট এই বিশ্বাসটার! সাধারণ মানুষ ভাবছে অসীম শক্তি এই মন্ত্রের! আর তাই এই মন্ত্রশক্তিটা যার অধীন —যার জানা আছে এই মন্ত্রশক্তি—তার নিজের শক্তিটাও বিশাল, প্রচণ্ড!

কার অধীন এই মন্ত্রশক্তি? যে কিনা প্রাচীন মিশরের পুরোহিত, তারই। তাই বাকি মানুষ তাকে দারুণ ভয় করে।

ভক্তি করে। আর এই ভয়-ভক্তির চোটেই নুয়ে পড়ে তার সামনে। অনেকখানি এলাকা জুড়ে অনেক মানুষ এক-আধজন মানুষের তাঁবে থাকতে শেখে। তারা সবাই নিজেদের তৈরি ফসলের বাড়তি ভাগটুকু তুলে দিয়ে আসে ওই এক-আধজনের ভাঁড়ারে। অনেকখানি এলাকার অনেক মানুষের বাড়তি ভাগ-টুকু জমতে জমতে ওই এক-আধজনের ভাঁড়ারে মোট সম্পদটার চেহারা একেবারে রাশি রাশি হয়ে ওঠে।

প্রাচীন মিশরে যে-কিনা পুরোহিত সেই হলো রাজা। মন্ত্র-শক্তিটা তারই শক্তি। তার নিজের শক্তি। একার শক্তি। আর, যেমন-তেমন শক্তি নাকি ? এরই দরুন তার অমন সাংঘা-তিক দাপট, অমন বিশাল ঐশ্বর্য! তাই তার কাছে ওই মন্ত্রের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। আর অমন মূল্যবান বলেই তার পক্ষে দরকার পড়লো মন্ত্রের কথাটা বাকি সবাইকার কাছ থেকে গোপন করা। এরই নাম মন্ত্রগুপ্তি। আর মন্ত্রগুপ্তির দরুনই বাকি সকলের চোখে মন্ত্রটা হয়ে দাঁড়ালো দারুণ রহস্যজনক।

কিন্তু রোসো। এইখানে গোটাকতক কথা খোলাখুলিভাবে বলে রাখি।

আদিম যুগের জাদুবিদ্যা কি রাতারাতি বদলে গিয়ে মন্ত্রশক্তির রূপ নিলো ? নিশ্চয়ই নয়। আদিম যুগের টোটেম্ দল কি রাতারাতি ভেঙে গিয়ে রাজায়-প্রজায় তফাত দেখা দিয়েছিলো ? তাও নয়। জাদু-বিশ্বাস বদলে মন্ত্রশক্তিতে পরিণত হতে বহু বছর সময় লেগেছিলো—হয়তো কয়েক হাজার বছর, কতো বছর তা

কে জানে! আদিম টোটেম্ দল বদলে রাজায়-প্রজায় তফাত ফুটে উঠতে বহু বছর সময় লেগেছিলো—কতো হাজার বছর তার হিসেব তো সত্যিই কেউ জানে না। তাই, তুমি যদি ভেবে বসো, অস্পষ্ট অতীতে কোনো কোনো ধূর্ত লোক আবিষ্কার করলো, মন্ত্রশক্তির মোহ ভাঙিয়ে অজস্র মানুষকে তাঁবে রাখা সম্ভবপর আর সেই উদ্দেশ্যে তারা রাতারাতি পুরোহিত সেজে বসতে লাগলো তাহলে নেহাতই ভুল বোঝা হবে। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে নিশ্চয়ই অনেক হাজার বছর সময় লেগেছিলো। যারা প্রথম মন্ত্রগুপ্তি শুরু করে তারা নিজেরাও বিশ্বাস করতো মন্ত্রের গোপন আর অলৌকিক শক্তিতে—তাদের কাছেও মন্ত্রশক্তির কথাটা নিশ্চয়ই বুঝেশুনে হিসেব করে লোক ঠকাবার কায়দা নয়।

আসলে, হাতিয়ারের উন্নতির দরুন মানুষের জীবনে যে একটা বিরাট ওলট-পালট এসে যাচ্ছিলো সে-কথা সে-যুগের মানুষেরা নিজেরাও বুঝতে পারে নি। টোটেম দলের সেই ছড়িয়ে-পড়া শক্তিটা ঠিক কেমনভাবে এক-আধজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিলো, সে-কথা ওই এক-আধজনও নিশ্চয়ই জানতে পারে নি।

মানুষ যতোদিন দল বেঁধে এক হয়ে বেঁচেছে ততোদিন পর্যন্ত দলের যে প্রধান তার ওপর নানা রকম দায়িত্ব। প্রভুত্ব নয়, দায়িত্ব। এইসব রকমারি দায়িত্বের মধ্যে একটা ছিলো জাদুর ব্যাপার সংক্রান্ত দায়িত্বও। পুরো দলটাই জাদুবিশ্বাসে মেতে উঠছে, কিন্তু দলটাকে ডাক দিচ্ছে যে কিনা প্রধান। ক্রমশ যতোই দলটার মধ্যে ভাঙন দেখা দিতে লাগলো ততোই যেন প্রধানের দায়িত্বটা তার নিজের শক্তিতে পরিণত হতে লাগলো।

জাতুর শক্তিটাও আর পুরো দলের শক্তি রইলো না! ক্রমশ তার একার শক্তিতে পরিণত হতে লাগলো। ফলে শেষ পর্যন্ত জাতু বিশ্বাসটা আর জাতু রইলো না, হয়ে দাঁড়ালো মন্ত্রশক্তি। কিন্তু মন্ত্রশক্তিটা যে মিছে কথা সেই প্রধানও নিশ্চয়ই তা জানতো না বা বুঝতো না। সেও ভাবতো, সত্যিই প্রচণ্ড শক্তি এই মন্ত্রের। সেও ভাবতো, এরই তেজে নদীতে বান ডাকে, সূর্য নিভে যায়। তাই সে যে নিজে ভেবে-চিন্তে লোক ঠকাবার একটা উপায় হিসেবে এই মন্ত্রশক্তির আবিষ্কার করলো তা নয়।

আসলে, সহজ করে বলতে গিয়ে কথাগুলো বড্ডো বেশি সোজাসুজি বলে ফেলা হচ্ছিলো। কয়েক হাজার বছরের ইতি-হাসটাকে কয়েক কথায় বোঝাতে গেলে ভুল বোঝার ভয় থাকে। অথচ কয়েক হাজার বছর ধরে যে-ঘটনা ঘটলো তাকে ছোট্ট করে বুঝে রাখাও দরকার। কী ঘটলো? আদিম টোটেম্ দল বদলে রাজায়-প্রজায় তফাত। জাতু-বিশ্বাস বদলে মন্ত্রশক্তি।

আর জাতু বিশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রশক্তির তফাতটা যে কী রকম আকাশ-পাতাল, তাও খুব ভালো করে মনে রাখা দরকার।

মন্ত্রগুপ্তির কথাটাকে ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে আদিম যুগের জাতু-বিশ্বাসটার ঠিক কী রকম জাতবদল হলো।

জাত-বদলটা ঠিক কী রকম হলো? একটু আগেই তো আমরা দেখলাম, আদ্যিকালের সেই জাতু-বিশ্বাস আর নতুন যুগের মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস—কল্পনা হিসেবে, ভুল বিশ্বাস হিসেবে, তুই-ই সমান। বৃষ্টির নাচ নাচবার দরুন বৃষ্টি হয় না; বৃষ্টি হবার আসল কারণটা অন্য। তেমনি কেউ মন্ত্র পড়ে দিলেই নীল নদে

বান ডাকে না ; বান ডাকবার আসল কারণটা অন্য। সত্যি কথাটা হলো, প্রকৃতির কতকগুলো নিয়ম আছে—প্রকৃতিতে কী ঘটবেনা-ঘটবে তা নির্ভর করছে এই নিয়মের ওপর। মানুষের মনে যতোদিন পর্যন্ত জাদু-বিশ্বাস ততোদিন পর্যন্ত প্রকৃতির এই সব নিয়মকানুন সম্বন্ধে কোনো হুঁশ নেই। তার বদলে সবাই মনে করছে, প্রকৃতি বুঝি মানুষের মনের হুকুম তামিল করতেই ব্যস্ত। মানুষের দল যদি আকাশে ঘনঘটার কল্পনা করে তাহলেই বৃষ্টি নামবে আকাশ কালো করে। এদিক থেকে, মন্ত্রবিশ্বাসটাও একই রকম : মানুষ যদি মন্ত্র পড়ে প্রকৃতিকে কোনো রকম হুকুম জানায় তাহলে প্রকৃতি বুঝি বাধ্য হবে ওই হুকুমটা তামিল করে দিতে। তাই মন্ত্রবিশ্বাসের বেলাতেও এ-কথায় হুঁশ নেই যে প্রকৃতি আসলে তার নিজের নিয়ম অনুসারেই চলে—মানুষের মনের চাহিদার ওপর প্রকৃতির নিয়ম সত্যিই নির্ভর করে না। এদিক থেকে তাই জাদু-বিশ্বাসের মধ্যে যেটা আসল ভুল তা মন্ত্রবিশ্বাসের মধ্যেও টেঁকে রইলো।

তবু তফাত হলো। মস্ত বড়ো তফাত। জাদু-বিশ্বাসের বেলায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম নিয়ে সমস্যাটাকে সমাধান করবার চেষ্টা। মন্ত্রবিশ্বাসের বেলায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সমস্যাটাকে সমাধান করবার চেষ্টা। দুয়ের মধ্যে সত্যিই আকাশ-পাতাল তফাত। আর, সেইদিক থেকে বলা যায়, আদিকালের জাদু-বিশ্বাসই যখন মন্ত্রবিশ্বাসের রূপ নিলো তখন যেন তার জাতবদল হয়ে গেলো।

জাদু-বিশ্বাসটা কারুর একার নয়। কেননা, মানুষ তখনো

দল বেঁধে এক হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে। তার হাতিয়ারের অবস্থা নেহাতই করুণ। আর অমন করুণ বলেই বাঁচবার জন্যে অগাধ সাহস লাগে। জাদু-বিশ্বাস মাতিয়ে তোলে পুরো দলকে, সেই সাহসে নির্ভর করে দলের মানুষদের পক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করা সম্ভবপর হয়। তাহলে, জাদু-বিশ্বাস ঠিক কোন ধরনের সমস্যার সমাধান করতে চাইছে? মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম নিয়ে সমস্যাটার।

মন্ত্রশক্তির বেলায় কিন্তু অন্যরকম। এক-আধ-জন মানুষ ওই মন্ত্রশক্তির সাহায্যে বাকি সকলের হত্যাকর্তাবিধাতা হয়ে উঠছে। সমস্যাটা তাই আর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম নিয়ে নয়; তার বদলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম নিয়ে।

অবশ্যই, সমাধান হিসেবে জাদু-বিশ্বাসটাও ভুল, মন্ত্রশক্তিও ভুল। দুইই কল্পনা। আর সেদিক থেকে দুয়ের মধ্যেই মানুষের দুর্বলতার পরিচয়। এ-দুর্বলতা কিন্তু আলাদা-আলাদা ধরনের। জাদু-বিশ্বাসের বেলায় পরিচয় পাই প্রকৃতির সামনে মানুষের দুর্বলতার। মন্ত্রশক্তির বেলায় পরিচয় পাই সমাজেরসামনে মানুষের দুর্বলতার—সমাজ বলতে তো ওই মানুষে-মানুষে সম্পর্কর কথাই।

জাদুবিশ্বাস থেকে ধর্মবিশ্বাস

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজো যে-সব মানুষের দল আদিম অবস্থায় পড়ে রয়েছে, চলো আর একবার তাদের খোঁজখবর নিয়ে আসা যাক।

তাদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস বলতে সত্যিই কি কোনো-কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় ? অনেকদিন পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিলো, পাওয়া যায়। কিন্তু আদিম মানুষদের হালচাল যতোই ভালো করে, স্পষ্টভাবে, জানা যাচ্ছে ততোই দেখা যাচ্ছে সে-ধারণাটা ভুল। ওদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস বলতে সত্যিই কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। তার বদলে রয়েছে জাদু-বিশ্বাস। আসলে সভ্য মানুষেরা আদিম মানুষদের মনোভাবটাকে বুঝতে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে নিজেদের সভ্য মনোভাব তাদের মধ্যেও কল্পনা করে বসে। ফলে জাদু-বিশ্বাসটাকেই ভুল করে মনে করে, বুঝি ধর্মবিশ্বাস! যেমন ধরো, দেখা গেলো আদিম মানুষ ব্রত করবার সময় ফুল ধরেছে। সভ্য মানুষ ফুল ধরে পুজো করবার সময়। তাই সভ্য মানুষ মনে করলো আদিম মানুষও বুঝি পুজোয় বসেছে! কিন্তু আসলে তো আর তা নয়। ব্রতর ফুলের সঙ্গে পুজোর ফুলের তফাত আছে।

ধর্মবিশ্বাস বলতে ঠিক কী বোঝায় ? বোঝায়, পৃথিবীর ঘটনাগুলো পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে ঘটছে না ; তার বদলে ঈশ্বরের ইচ্ছেয় ঘটছে। এই ঈশ্বরকে ফুল দিয়ে, নৈবেদ্য দিয়ে খুশি করা যায়, তাঁর ইচ্ছের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়—ইত্যাদি।

আদিম মানুষদের হালচালটা ভালো করে পরীক্ষা করো। দেখবে, দেবতা মানে কী, ঈশ্বর মানে কী, ভগবান মানে কী—এ-সব কথা ওরা কিছুই জানে না। ওরা জানে না পুজো করতে, প্রার্থনা করতে, ফুলনৈবেদ্য দিয়ে দেবতাকে খুশি করবার কল্পনা করতে।

ওদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় নেই। তার বদলে, পরিচয় শুধু জাদু-বিশ্বাসের।

আদিম মানুষদের সম্বন্ধে এই খবরটি জোগাড় করে ঠিক কী বুঝতে পারা গেলো? বুঝতে পারা গেলো, বহুকাল আগে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও যখন ওই রকম আদিম অবস্থা ছিলো তখন তাদের মধ্যেও ধর্মবিশ্বাস বলে কিছুই দেখা দেয় নি। ধর্মবিশ্বাসের বদলে তাদের মনেও ছিলো শুধুমাত্র জাদু-বিশ্বাস। কেননা, আজকের আদিম মানুষদের যে-দশা এককালে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও ঠিক সেই দশাই ছিলো।

জাদু-বিশ্বাসটা বিশ্বাস হিসেবে নিশ্চয়ই ভুল। তবুও এই ভুল বিশ্বাসই মানুষকে আদিম যুগে পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবটা কিন্তু অন্য রকম। সংগ্রামের বদলে প্রার্থনা—করুণা চাওয়া, দয়া চাওয়া, আশীর্বাদ চাওয়া।

জাদু-বিশ্বাসের সঙ্গে একটা কাজ করবার যোগ রয়েছে। ব্রতর সঙ্গে পুজোর তফাতটা তো আগেই দেখা গিয়েছে। ফসলের কামনায় মানুষ যখন ব্রত করছে তখন কারুর কাছ থেকে ভিক্ষে চাইবার মতো করে ফসল চাইছে না; তার বদলে নিজেই ফসল ফলাবার চেষ্টা করছে। অভিনয় করবার আগে যে-রকম মহড়া দেবার ব্যবস্থা অনেকটা যেন সেইভাবেই ব্রতর বেলাতেও ফসল ফলানোর আগে ফসল ফলানোর একটা মহড়া দিয়ে নেওয়া। যেখানে জাদু-বিশ্বাস সেখানেই এই রকম। শিকারে বেরুবার আগে শিকার-নাচ নাচা হলো—যেন, শিকারের আগে শিকারেরই একটা মহড়া দিয়ে নেওয়া।

এইদিক থেকে মানতেই হবে, জাদু-বিশ্বাসটা যতোই আজগুবি হোক না কেন, তার মধ্যে সংগ্রামের চেষ্টাটা স্পষ্ট। কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাস মনে জাগবার সময় থেকে অন্য রকম—সংগ্রামের বদলে সংগ্রামের ওপর রাশ টানবার ব্যবস্থা।

এই কথাটা নানান অর্থে সত্যি। কী কী অর্থে তাই দেখা যাক।

প্রথমত, এই বিশ্বাসটির সাহায্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের ওপর রাশ টানা সম্ভবপর হলো। কেননা, এই বিশ্বাসই মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চাইলো : শোষণ শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। যেখানে-যেখানে ধর্মবিশ্বাসের প্রথম বিকাশ সেখানে-সেখানেই দেখা যাচ্ছে এই বিশ্বাসেরই অঙ্গ হিসেবে বলা হচ্ছে : রাজা আসলে ভগবানেরই সন্তান বা ভগবানেরই প্রতিনিধি। আর যদি তাই হয়, তাহলে প্রজাদের পক্ষে রাজার সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়াও যা আর খোদ ভগবানের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়াও তাই। অতএব, ধর্মবিশ্বাস অনুসারে প্রজাদের পক্ষে মুখ বুজে রাজার আদেশ পালন করতে হবে, তারই ভাঁড়ারে মুখ বুজে তুলে দিয়ে আসতে হবে নিজেদের হাতে তৈরি সম্পদের একটা অংশ। এই নিয়ে কোনোরকম ওজর-আপত্তি করা চলবে না। সংগ্রাম নয়—দাসত্ব।

ধর্মবিশ্বাস মানুষকে শেখালো, পৃথিবীতে যে-কোনো ঘটনাই ঘটুক না কেন, তার জন্যে কোনো মানুষ দায়ী নয়। কেননা কোনো ঘটনাই মানুষের ইচ্ছায় বা মানুষের চেষ্টায় ঘটছে না—সবই ঘটছে এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে, ঈশ্বরের ইচ্ছেয়। আর যদি তাই হয় তাহলে সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা

বা লাঞ্ছনা-অপমান যতোই ঘটুক না কেন তার জন্যে রাজা দায়ী নয়, রাজপেয়াদা দায়ী নয়—এক কথায় কোনো মানুষকেই দায়ী করা চলে না। নালিশ যদি করতেই হয় তো খোদ ভগবানের বিরুদ্ধে করতে হবে। কিন্তু সত্যিই তো আর ভগবানের বিরুদ্ধে নালিশ করা যায় না। এদিকে, আসল কথাটা কিন্তু একেবারে অন্য কথা। কেননা, সত্যি বলতে তো মানুষের দৈন্য-অপমানের আসল কারণ হলো মানুষই। যারা অপরের তৈরি সম্পদ আত্মসাৎ করছে, অপরকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখছে, তারাই। তাই তারা দরিদ্র-সাধারণের মনে ধর্মবিশ্বাস জাগবার দরুন যে কতোখানি নিরাপদ হতে পারছে তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করা কঠিন নয়। একটা সহজ নমুনা দেখো। পাইক-পেয়াদা লাগিয়ে নীলকর সাহেবেরা আমাদের চাষীদের সর্বনাশ করলো, চালালো অকথ্য অত্যাচার। চাষীরা যদি শুধুই কপাল চাপড়ে বলে, এ-সবই আসলে ঘটছে ভগবানের ইচ্ছেয়—এর জন্যে আসল দায়িত্বটা নীলকর সাহেবদের নয়—তাহলে ওই নীলকর সাহেবদের পক্ষে কতোখানি নিরাপদ হওয়া সম্ভব তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারো।

আরো কথা আছে। ধর্মবিশ্বাসের সাহায্যে বঞ্চিত মানুষদের ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব তাদের সমস্ত দৈন্য-দুর্গতির কথা। আর নিজেদের দৈন্য-দুর্গতিটার কথাই যদি তারা ভুলে যায় তাহলে তারা মুখ বুজে অপরের সেবা করতে রাজি হবে। আপত্তি করবে না। বিদ্রোহ করবে না। কেন করবে না? কেন তারা ভুলে থাকবে নিজেদের আসল অবস্থাটার কথা? কেননা, ধর্মবিশ্বাস

যে তাদের সামনে ধরে রেখেছে এক রঙিন ভবিষ্যতের ছবি। পরলোকের ছবি। পরকালের ছবি। স্বর্গসুখের ছবি। শান্তির ছবি। কী গভীর সেই শান্তি! শেষ নেই সেই সুখের। ওই ছবি দেখতে দেখতে মানুষের মন এমনই ঝিমিয়ে যায় যে ইহ-কালের জ্বালা-যন্ত্রণার বোধটাই যেন নষ্ট হয়ে যায়। জ্বালা থাকে, তবু খেয়াল থাকে না এই জ্বালার। আর তাই এই জ্বালা-যন্ত্রণার কারণগুলোকে দূর করবার সংগ্রামে তাদের হাত ওঠে না। মন নড়ে না।

তাহলে, ধর্মবিশ্বাস মানুষকে সংগ্রামের বদলে সহ্য করতেই শেখায়। অর্থাৎ কিনা, এই বিশ্বাসের সাহায্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের ওপর রাশ টানবার আয়োজন।

কিন্তু, শুধুমাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের ওপরেই নয়। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের পথেও ধর্মবিশ্বাস দারুণ বাধা সৃষ্টি করে। তার কারণ, পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামে জিততে হলে পৃথিবীর নিয়মকানুনগুলোকেই ঠিকমতো চিনতে হয়, জানতে হয়। তা যদি জানতে পারা না যায় তাহলে মানুষ তার নিজের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর এই নিয়মকানুনগুলোকে নিয়োগ করতে পারে না—ওইভাবে নিয়োগ করবারই নাম হলো পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামে জিততে পারা। এদিকে ধর্মবিশ্বাস এক দারুণ বাধা হয়ে দাঁড়ালো পৃথিবীর নিয়ম-কানুনগুলোকে চেনবার পথে। এই কথাটা একটু ভালো করে বোঝা দরকার।

পৃথিবীকে জয় করা মানে?

মানুষ পৃথিবীকে জয় করছে। কিন্তু কোন অর্থে? কেমন করে? যে-অর্থে বিদেশীর দল একটা দেশকে জয় করতে আসে সেই অর্থে নাকি? বিদেশী বিজয়ীর দল যে-দেশটাকে জয় করলো সেটার ওপর চাপিয়ে দিলো নিজেদের দরকার-মাফিক আইন-কানুন। কিন্তু পৃথিবীর কাছে মানুষ তো আর ওই রকম বিদেশীর মতো নয়। মানুষ পৃথিবীর বাইরের কোথা থেকে আসছে না; এই পৃথিবীরই সে একটা অংশ। এই পৃথিবীরই নানান জিনিস মিলে তৈরি করেছে মানুষকে। পৃথিবীর যে-সব নিয়ম-কানুন তা একান্তভাবেই পৃথিবীর নিয়মকানুন—পৃথিবীতে যাই ঘটুক না কেন তা ওই নিয়ম অনুসারেই ঘটবে। হাজার চেষ্টা করেও মানুষ সে-সব নিয়মকানুনকে উড়িয়ে দিতে পারে না। হাজার চেষ্টা করেও মানুষ পারে না নিজের মর্জি-মাফিক কোনো নিয়মকে পৃথিবীর ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিতে। তাই মানুষের পক্ষে পৃথিবীকে জয় করাটা বিদেশীদের পক্ষে একটা কোনো দেশ জয় করবার মতো হতেই পারে না। তবুও একথাও তো ঠিক যে মানুষ জয় করছে পৃথিবীকে। কোন অর্থে জয় করছে? কেমনভাবে জয় করছে? আসলে মানুষ করছে কি, পৃথিবীর নিয়মকানুনগুলোকেকেই খুব স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করছে, চিনছে, জানছে। আর স্পষ্টভাবে চিনতে ও জানতে পারছে বলেই এ-গুলোকে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যে সাধন করিয়ে নিতে পারছে: পৃথিবীতে যা ঘটলো তা মানুষের কল্পনা-মাফিক কোনো নিয়মের

দরুন ঘটলো না—ঘটলো পৃথিবীর নিয়মেরই দরুন। কিন্তু মানুষ ওই নিয়মটিকে চিনতে পেরেছে বলেই এমন ব্যবস্থা করে নিলো যাতে ঘটনাটির মোট ফলটা মানুষের জন্যেই সুখ-সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে দিলো। এরই নাম, মানুষের পক্ষে পৃথিবীকে জয় করা। দুচারটে নমুনা দেখলেই কথাটাকে ভালো করে বোঝা যাবে। জমিতে বীজ পুতলে গাছ হয়। এ কি পৃথিবীর নিয়ম, না মানুষের মর্জি? পৃথিবীর নিয়ম নিশ্চয়ই। বহুদিনের চেষ্টায় মানুষ এই নিয়মটিকেই চিনতে পারলো। পারবার পর কী করলো? পৃথিবীকে দিয়েই নিজের জন্যে রাশি রাশি ফসল ফলিয়ে নিতে লাগলো। ফসলটা ফলছে পৃথিবীর নিজের নিয়ম অনুসারেই; কিন্তু ওই নিয়মটিকে জেনেছে বলেই মানুষ এমন ব্যবস্থা করে রাখছে যার দরুন তারই চাহিদা-মতো ফসল পৃথিবী যেন তার জন্যে তৈরি করে দিচ্ছে। কিংবা ধরো, কয়লার মধ্যে সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, কয়লায় আগুন ধরিয়ে দিলে সেই শক্তিটা বেরিয়ে আসে। এ-নিয়ম ঠিক কার নিয়ম? পৃথিবীর নিয়ম নিশ্চয়ই। মানুষের খুশি-অখুশির ওপর তো আর এ-নিয়মটা নির্ভর করে না। মানুষ কী করলো? ওই নিয়মটিকেই জেনে ফেললো। আর জেনে ফেললো বলেই, মাটি খুঁড়ে কয়লা তুলে এনে তাইতে আগুন ধরিয়ে বের করে আনলো লুকোনো শক্তিটাকে—এই শক্তিই এবার মানুষের হয়ে খেটে দেবে, সে-খাটুনির জন্যে আর মানুষকে নিজের গতর খরচা করতে হবে না। অর্থাৎ কিনা, পৃথিবীর নিয়ম অনুসারেই পৃথিবীতে একটি ঘটনা ঘটলো, কিন্তু সে-ঘটনার দরুন লাভটা হলো মানুষের। এরই নাম, মানুষের পক্ষে পৃথি-

বীকে জয় করতে পারা। আর এইভাবে জয় করতে পারার মূলে রয়েছে পৃথিবীর নিয়মকেই স্পষ্টভাবে জানতে পারা বা চিনতে পারা।

এই কথাগুলি মনে রেখে এবার ফেরা যাক আমাদের যে-কথা হচ্ছিলো তারই আলোচনায়। বলছিলাম, ধর্মবিশ্বাস বাধা হয়ে দাঁড়ালো, শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের পথে নয়, পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের পথেও। কেননা, পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামে ঠিকমতো এগুতে হলে পৃথিবীর নিয়মকানুনগুলোকেই ঠিকভাবে চিনতে পারা দরকার। অথচ, ধর্মবিশ্বাস মানুষকে দেখাতে লাগলো, ছুনিয়ায় যেখানে যা-কিছুই ঘটুক না কেন সবই ঘটছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। পৃথিবীর নিজের নিয়ম অনুসারে কোথাও কিছু ঘটছে না। সবই তাই আসলে অলৌকিক ঘটনা। অথচ, নিয়মকে আবিষ্কার করবার ওপরেই নির্ভর করছে পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের হারজিত। তাহলে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের পথে এই ধর্মবিশ্বাস মস্তো বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না?

এদিকে, ক্ষমতাবান মানুষদের পক্ষে বঞ্চিত মানুষদের দাবিয়ে রাখবার কাজেও ধর্মবিশ্বাস খুবই উপযোগী। ক্ষমতাবানেরা তাই আইন জারি করলো, ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করা চলবে না। ফলে, পৃথিবীর নিয়মকানুনকে স্পষ্টভাবে চিনতে যাওয়াটাই পাষণ্ডের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ালো। পাষণ্ডদের বিরুদ্ধে বিধান হলো কঠিন শাস্তির। কীরকম শাস্তি তার নমুনা মনে আছে তো? পৃথিবী যে সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে, এই লৌকিক নিয়মটিকে সত্যি বলে স্বীকার করতে গিয়ে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওকে অপমান আর

নির্যাতন ভোগ করতে হলো। অথচ, গ্যালিলিও যে-কথা বলেছিলেন তা তো আর মিথ্যে কথা নয়, সত্যি কথাই। তাহলে, সত্যি কথা বলবার দরুনও মানুষের ওপর কঠিন শাস্তির বিধান হয়েছে! বিধানটা দেওয়া হয়েছে কেন? কেননা, ধর্মবিশ্বাস। সত্যের সন্ধানে মানুষের যে-অভিযান বহুদিন ধরে তার পথ রোধ করে রেখেছিলো এই বিশ্বাসটি।

ইতিহাসে এ-ধরনের ঘটনা একবার ঘটেনি। বারবার ঘটেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে ধর্মবিশ্বাসের বাধাটা সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক।

বিজ্ঞানে বিশ্বাস

তবুও, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ তো এগিয়েছেও। কী করে এগুলো?

ধর্মবিশ্বাসের দরুন নয়। তার ঠিক উলটো এক বিশ্বাসের দরুন।

সে আবার কিসের বিশ্বাস? তার নাম বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান মানে কী? ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তফাতটা কী রকম? কেমন করে জন্ম হলো বিজ্ঞানের?

বিজ্ঞানের মূল কথা হলো, এই লৌকিক পৃথিবীটাকে একান্তই লৌকিক জিনিস হিসেবে চেনবার চেষ্টা করতে হবে। পৃথিবীতে নানান ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু অকারণে কোনো কিছুই ঘটছে না। প্রতিটি ঘটনার পেছনে নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। এবং সেই কারণটি নেহাতই লৌকিক—নেহাতই পার্থিব কারণ। যেখানে যা কিছুই ঘটুক না কেন তার পেছনে একটা-না-একটা

নিয়ম আছে। ওই নিয়ম একান্তই পার্থিব নিয়ম—পৃথিবীর নিয়ম। মানুষ সেই সব নিয়মকে যতো ভালো করে চিনতে পারে, জানতে পারে, ততোই এগুলিকে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নিয়ে পারে। ততোই বেড়ে যায় পৃথিবীর ওপর মানুষের কর্তৃত্ব।

এই বিশ্বাসগুলিরই নাম হলো বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস।

তাহলে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তফাতটা কী রকম? ধর্ম বলছে, সবই শেষ পর্যন্ত কোনো অলৌকিক শক্তির দরুন ঘটছে, ভগবানের ইচ্ছেয় ঘটছে। শুধুমাত্র লৌকিক কারণের দরুন একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে এ-কথা ধর্মবিশ্বাস অনুসারে অসম্ভব। আর তাই ধর্মবিশ্বাস অনুসারে পৃথিবীকে চিনে, পৃথিবীকে জয় করবার কথাটাও অসম্ভব। সবই যদি শেষ পর্যন্ত ভগবানের ইচ্ছেয় ঘটে তাহলে শুধুমাত্র প্রার্থনারই মানে থাকতে পারে, মানে থাকতে পারে শুধুমাত্র ভগবানের আশীর্বাদ চাওয়ার। প্রার্থনা-উপাসনা বা ফুল-নৈবেদ্যর সাহায্যে তাঁর মন গলাবার চেষ্টা করতে পারো। তিনি যদি তোমার ওপর খুশি হন তাহলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। কিন্তু তুমি নিজের জোরে, নিজের চেষ্টায়, কোনো কিছু পাবার কথা ভেবো না। তা যে পাবার নয়।

তাহলে, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের তফাতটা একেবারে আকাশ-পাতাল! অলৌকিক ছাড়া ধর্ম আর কিছুই মানে না। লৌকিক ছাড়া বিজ্ঞান আর কিছুই মানে না। বিজ্ঞান জয় করতে চাইছে পৃথিবীকে। ধর্ম বলছে, জয় করবার কথাটাই আজগুবি।

নমুনা দেখা যাক। গ্রামে মহামারী দেখা দিলো: বসন্ত রোগ। ধর্ম বললো, মার দয়া। "দয়া" শব্দটা অবশ্যই প্রাণের ভয়ে বলা।

কিন্তু, আসল কথাটা কী? শীতলা দেবীর রাগ হয়েছে, রাগের চোটে তিনি গ্রামকে গ্রাম উজোড় করে দিচ্ছেন। তা হলে উপায়? তাঁর রাগ থামাতে হবে। কী করে থামবে? পুজো দিতে হবে! তাই পেয়ে তাঁর রাগ পড়বে। কিন্তু বিজ্ঞান বলবে: উঁহু। মহামারী বলে এই যে-ঘটনাটি ঘটছে এটি নেহাতই লৌকিক ঘটনা। এর পেছনে রয়েছে পৃথিবীর কোনো কারণ। সেই কারণটা বের করতে হবে। গবেষণা করতে করতে বিজ্ঞান সেই কারণটির সন্ধান সত্যিই পেলো। কী কারণ? এক রকম বীজাণু। এই বীজাণুর আক্রমণ হলে মানুষের ওই রোগ হয়। বিজ্ঞান আরো জানালো, এই বীজাণুর দল কেমন করে আমাদের আক্রমণ করে, আক্রমণ করবার পর কী কী ব্যবস্থা করলে বীজাণুরা হেরে যায়, আক্রমণ করবার আগে কী কী ব্যবস্থা করলে বীজাণু আর সুবিধে করতে পারে না,—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইভাবে, বিজ্ঞান বসন্ত রোগ সম্বন্ধে নানা রকম নিয়মকানুন আবিষ্কার করলো। লাভটা কী হলো? নিয়মকানুনগুলোকে জানতে পেরে মানুষ সেগুলোকে নিজের উদ্দেশ্যে লাগাতে পারলো, জয় করা গেলো বসন্ত রোগের ভয়।

সময়মতো টিকে নাও; বসন্ত রোগ হবে না। শীতলামায়ের পায়ে মাথা কুটেও আমাদের দেশে গাঁয়ের পর গাঁ বসন্ত রোগে উজোড় হয়ে গিয়েছে। কেননা বসন্ত রোগের সত্যিকারের কারণ হলো ওই বীজাণু এবং তা নেহাতই লৌকিক জিনিস। তাই শুধুমাত্র লৌকিক ব্যবস্থার সাহায্যেই তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ধর্ম তো আর তা মানে না।

তাহলে, পৃথিবীর নিয়মকানুনগুলোকেই স্পষ্টভাবে চেনা বা জানা এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে এই নিয়মগুলোকেই মানুষের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করতে পারা—এই হলো বিজ্ঞান সম্বন্ধে আসল কথা। এবং ধর্মের মূল কথার সঙ্গে এসব কথার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বাধা

কিন্তু তবুও একটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রকৃতির নিয়মকানুনগুলোকে স্পষ্টভাবে চেনা-জানার সঙ্গে ধর্মের বিরোধটা এতোখানি হলেও এ-বিরোধ একেবারে রাতারাতি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ কিনা, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধটা স্পষ্ট হতে বহু সময় লেগেছে—হয়তো কয়েক হাজার বছরের সময়।

একটা নমুনা থেকেই কথাটাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। প্রাচীন মিশরের কথাই আবার ধরা যাক। নীল নদে বন্যা আসবার দিনটির কথা আগে থাকতে হিসেব করে বুঝতে পারা, বা জানতে পারা, নিশ্চয়ই পৃথিবীর নিয়মকানুন সম্বন্ধে একটা জ্ঞান পাওয়াই—সে-কালের তুলনায় এ-জ্ঞান মানুষের পক্ষে এক পরমাশ্চর্য আবিষ্কার। কিন্তু যারা ওই জ্ঞান পেলো তাদের কাছে এই কথাটি ধরা পড়ে নি যে আসলে ওটা শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়ম-সংক্রান্ত জ্ঞানই। তাদের কল্পনায় লৌকিক-অলৌকিকের মধ্যে সীমারেখাটা মোটেই স্পষ্ট নয়। তারা বৈজ্ঞানিক ছিলো না, ছিলো পুরোহিত। তাই প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞানটা তারা পেলো সেটাকে নিছক প্রকৃতির জ্ঞান বলে বুঝতে না পেরে যেন

মুড়ে রাখবার চেষ্টা করলো আলৌকিক কল্পনার আবরণ দিয়ে। অলৌকিক কল্পনার আবরণটা কী রকম? মন্ত্রশক্তির কথা। কিংবা হয়তো, নীল নদের অধিষ্ঠাতা-দেবতার কথাও। তারা জানলো, অমুখ দিন অমুখ সময়ে নীল নদে বন্যা আসবে; তবু তারা ভাবলো বন্যা আসবে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে, কিংবা হয়তো নীল নদের অধিষ্ঠাতা-দেবতাটির দয়ায়—এই দেবতাকে পুজো করে, নৈবেদ্য দিয়ে খুশি করা যায়, আর খুশি করতে পারা যায় বলেই বন্যা আসে।

প্রাচীন মিশরের পুরোহিতেরা এই রকম আরো নানান দিক থেকে প্রকৃতির জ্ঞান সঞ্চয় সত্যিই করেছিলো। তারা গ্রহণের দিনক্ষণটা হিসেব করতে শিখেছিলো, শিখেছিলো জমিজায়গার হিসেব নিয়ে জ্যামিতির আঁকজোঁকের কৌশল, আরো নানা রকম। কিন্তু তাদের সেই জ্ঞান বিজ্ঞান হতে পারে নি। কেননা, তার ওপর ছিলো ধর্মের আবরণ। তাই তাদের যদি তুমি পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক বলতে যাও তাহলে ভুল বলা হবে। কেননা বিজ্ঞানের মূল কথা হলো, লৌকিক পৃথিবীটাকে নিছক লৌকিক পৃথিবী বলেই চেনা, পৃথিবীর ঘটনাগুলি যে নিছক লৌকিক কারণে ঘটছে তা বুঝতে পারা, পৃথিবীর নিয়মকানুনগুলির সঙ্গে সত্যিই যে অলৌকিক শক্তির সম্পর্ক নেই তা বুঝতে পারা। প্রাচীন সভ্যতার পুরোহিতেরা তা বুঝতে পারে নি; তাই সত্যিকারের পৃথিবী সম্বন্ধে নানা রকম সত্যিকারের জ্ঞান পাওয়া সত্ত্বেও তারা পুরোহিতই হয়ে রইলো—বৈজ্ঞানিক হতে পারলো না।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে পৃথিবীর যেটুকু জ্ঞান তারা পেলো সেটুকু জ্ঞান পৃথিবীকে জয় করবার ব্যাপারে মানুষের কোনো কাজেই লাগলো না। নিশ্চয়ই লেগেছিলো। নীল নদে বন্যা আসবার দিনক্ষণটুকুকে হিসেব করতে পারবার ওপর প্রাচীন মিশরে চাষবাসের উন্নতি নির্ভর করেছিলো অনেকখানিই।

কিংবা, সে-যুগের আর একটা কীর্তির দিকে চেয়ে দেখো: মিশরের ওই পিরামিডের কথা বলছি। সত্যিই তো আর ফুসমন্তরের চোটে মানুষ এ-রকম একটা কাণ্ড করে বসতে পারে না—এর জন্যে পৃথিবীর নিয়মকানুন সম্বন্ধে কতো-কতো জ্ঞান হওয়া দরকার। কিন্তু সে-জ্ঞান হয়েছিলো বলেই কি বলবো, সে-যুগে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে? নিশ্চয়ই নয়। কেননা, এই পিরামিড একদিকে যে-রকম সাক্ষী দিয়ে বলছে, মানুষ অনেক কিছুই শিখেছে, অনেক কিছুই জেনেছে,—আবার অপর দিকে সেই রকমই আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, মানুষের মনের ওপর কয়েকটি অলৌকিক ধারণার প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। মানুষ যে এতোবড়ো একটা কাণ্ড করে বসলো তা কী ভেবে করলো? কেন করলো? মরা রাজার আত্মা নাকি ওই বিরাট প্রাসাদটির মধ্যে বসে ভূরিভোজ খাবে, আয়েস করবে, বাঁশি বাজাবে! এটা নিশ্চয়ই কুসংস্কার, ধর্মমোহ, অন্ধ অলৌকিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটিরই হাত থেকে মিশরের সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানীর মনও মুক্তি পায় নি। তাই, সত্যি বলতে, জন্মও হয় নি বিজ্ঞানের।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার প্রত্যেকটি ঘাঁটির বেলাতেই এই কথা। প্রাচীন ব্যাবিলোনের পুরোহিতেরাও অনেক জ্ঞান পেয়েছিলো। কিন্তু সে-জ্ঞানের সবটুকুর ওপরেই প্রচণ্ড প্রভাব ধর্মমোহর—পৃথিবীর নিয়মকানুন সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান তার সবটাই পুরোহিতদের মনে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে, ধর্মবিশ্বাসের ছায়ায়। মহেনজোদারো আর হরপ্পার বেলাতেও হয়তো এই রকমই। অবশ্যই, মিশর বা মেসোপটেমিয়ার মতো সিন্ধুসভ্যতার বেলাতেও যে বিরাট কোনো এলাকা জুড়ে সত্যিই কোনো পুরোহিত-রাজের একচ্ছত্র রাজত্ব গড়ে উঠেছিলো তার ধ্রুব প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু এখানে মাটিও খোঁড়া হয় নি তেমন ভালো করে। তাই ভালো করে মাটি খোঁড়বার পরও যে সে-প্রমাণ পাওয়া যাবে না, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। তাছাড়া, যেটুকু মাটি খোঁড়া হয়েছে তার ওপর নির্ভর করেই কোনো কোনো ঐতিহাসিক আন্দাজ করছেন যে হরপ্পা-মোহেনজোদারোর বেলাতেও প্রাচীন-মিশর বা মেসোপটেমিয়ার মতোই অনেকখানি এলাকা জুড়ে এক-আধজন মানুষের একচ্ছত্র শাসন খুব সম্ভব সত্যিই গড়ে উঠেছিলো।

কথাটা কেন তুললাম, তাই বলি। অনেকখানি এলাকা জুড়ে অনেক মানুষের ওপর দু-একজন লোকের যদি একচ্ছত্র প্রভুত্ব গড়ে ওঠে তাহলে সে-আবহাওয়ায় বিজ্ঞানের জন্ম হওয়ায় সত্যিই বাধা থাকে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার চিহ্ন যে-যে জায়গায় সেখানে সেখানে এই রকম একচ্ছত্র প্রভুত্বেরই পরিচয়। আর তাই, মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক ধারণা জন্মাবার বাধাও।

বাধা কেন? কেননা অতোখানি এলাকা জুড়ে অতো মানুষকে কোনো পুরোহিত-রাজ যদি তাঁবে রাখতে চায় তাহলে তাদের মনে দেবদ্বিজে ভয়ভক্তিটা জাগিয়ে রাখা দরকার। অর্থাৎ কিনা দরকার ধর্মবিশ্বাসের। ইসোক্রেটিস বলে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের এক গ্রীক ঐতিহাসিক এই কথাটি বেশ সোজাসুজি ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, প্রাচীন মিশরের আইনকর্তারা সযত্নে নানা রকম কুসংস্কার পালন করতো। কেননা এগুলির সাহায্যে দেশের লোককে সাধারণভাবে হুকুম তামিল করবার কাজে অভ্যস্ত করা যায়।

॥ বিজ্ঞানের জন্ম ॥

প্রাচীন মিশর তাই সভ্যতার প্রথম লীলাভূমি হলেও বিজ্ঞানের জন্মভূমি হতে পারলো না। মনে রেখো, বিজ্ঞান বলতে প্রকৃতির নিয়মকানুনকে শুধু জানা নয়, ধর্মবিশ্বাসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সেগুলিকে নিছক প্রকৃতিরই নিয়মকানুন বলে চিনতে পারাও।

এই অর্থে বিজ্ঞানের জন্ম হলো কোথায়? সত্যি বলতে কি, এ-প্রশ্নের এক কথায় কোনো জবাব দিতে পারা কঠিন। কেননা সমস্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে এখনো খুব ভালো রকমের গবেষণা হয় নি। যেমন ধরো, প্রাচীন ভারতে ধর্মবিশ্বাসের মোহ কাটিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের আওতায় পৌছোনো সম্ভব হয়েছিলো কিনা সে-কথা আমরা স্পষ্টভাবে জানি না। তার কারণ আমাদের দেশের প্রাচীন যুগ নিয়ে এখনো ঢের গবেষণা বাকি রয়েছে।

তবে অন্তত এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় সওয়া পাঁচশো বছর আগে গ্রীক সভ্যতার আবহাওয়ায় আসল অর্থে বিজ্ঞানের জন্ম সত্যিই সম্ভব হয়েছিলো। তাই সাধারণত ওই সভ্যতারই একজন পণ্ডিতকে পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক বলা হয়।

নাম তাঁর থ্যালিস্‌। নিবাস মিলেটাস শহর। এ-শহর ছিলো সে-কালের এসিয়া মাইনরে গ্রীকদের সওদাগরির এক ঘাঁটি। অবশ্য, শহর হিসেবে প্রাচীন মিশরের শহরগুলির তুলনায় এই মিলেটাস শহর নেহাতই ছোটোখাটো। তবুও এখানেই বিজ্ঞানের জন্ম সম্ভব হলো, তার কারণ এখানে ছিলো না কোনো পুরোহিত-রাজের একচ্ছত্র রাজত্ব আর তাই অনেকখানি এলাকা জুড়ে অনেক মানুষকে তাঁবে রাখবার জন্যে কোনোরকম কুসংস্কারের প্রয়োজনও। তার বদলে শাসন চালাতো শহরের সমস্ত স্বাধীন মানুষ সমানে সমান হয়ে—গ্রীক গণতন্ত্রের কথা তো জানবার কথার সপ্তম বইতে পড়েছো। এই গণতন্ত্রের আবহাওয়াই যে মানুষকে ধর্মমোহ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিলো সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এ-হেন শহরের থ্যালিস্‌ বলে ওই পণ্ডিতটি কী এমন কাণ্ড করেছিলেন ? তাহলে শোনো, সে-গল্প খুলেই বলি।

২৮শে মে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৫ সাল। মিলেটাস শহরের রাস্তায় সেদিন ছেলেবুড়োর সে কী ভিড়! তারা সবাই আকাশের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। ব্যাপারটা কী ?

ওই দিন নাকি সূর্যগ্রহণ হবার কথা। ওরা তাই ভিড় জমিয়েছে সূর্যগ্রহণ দেখবে বলে। কী করে জানলো যে সূর্যগ্রহণ হবে? কেননা থ্যালিস্ আগে থাকতেই হিসেবপত্র করে সে-কথা বলে রেখেছিলেন। আর আশ্চর্য বলতে হবে থ্যালিস্-এর হিসেব। মিলেটাসবাসীরা অবাক হয়ে দেখলো, সূর্যে সত্যিই গ্রহণ লেগেছে!

কিন্তু থ্যালিসের আগে এই রকমের হিসেব করবার কৌশলটা আর কেউই কি জানতো না নাকি? জানতো বই কি। মিশরের পুরোহিতেরা জানতো। ব্যাবিলোনের পুরোহিতেরা জানতো। আজকালকার কোনো কোনো পণ্ডিত জোর গলাতেই বলছেন, এই ধরনের পুরোহিতদের কাজ থেকেই থ্যালিস্ শিখেছিলেন হিসেব করবার ওই বিদ্যেটা।

তবুও তাদের কাউকে বৈজ্ঞানিক বলবো না কেন? কেননা তাদের কথাবার্তার সঙ্গে থ্যালিসের কথাবার্তার আকাশ-পাতাল তফাত ছিলো।

কিসের তফাত?

সূর্যগ্রহণ যে কবে হবে, কখন হবে, এই নিয়ে হিসেব করতে শিখলেও সূর্যগ্রহণ যে কেন হয় সে-কথা আগেকার কালের কোনো পুরোহিতই ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। তাদের কাছে সবই ছিলো দেবতা আর অপদেবতার কাণ্ডকারখানা, সবই শুধু অলৌকিক ঘটনা। সূর্যগ্রহণ দেখে তারা ভাবতো, আকাশে হানা দিয়েছে অন্ধকারের এক অপদেবতা। শাঁখ বাজিয়ে, মন্ত্র পড়ে, উপোস দিয়ে তাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করতে হবে। তাই

আকাশে যতোক্ষণ সূর্যগ্রহণ ততোক্ষণ ধরে মরলোকের মানুষ ভয়ে একেবারে কাঁটা!

অথচ, মিলেটাস শহরের বাসিন্দারা সূর্যগ্রহণ দেখে সেদিন আর এতোটুকুও ভয় পেলো না। কেননা, আগে থাকতে থ্যালিস যে সূর্যগ্রহণের শুধু দিনক্ষণটুকু বলে দিয়েছিলেন তাই নয়, তাছাড়াও তিনি বলেছিলেন সূর্যগ্রহণের আসল কারণটার সঙ্গে দেবতা বা অপদেবতা কোনো কিছুরই সম্পর্ক নেই। থ্যালিসের মতে, চাঁদটা যখন সোজাসুজি সূর্যকে পেরিয়ে যায় তখনই আমরা দেখি সূর্যগ্রহণ।

আর এইভাবে লৌকিক দুনিয়াটাকে শুধু মাত্র লৌকিক দুনিয়া হিসেবে চেনবার পথ খুলে দিলেন বলেই থ্যালিস্‌ পেলেন প্রথম বৈজ্ঞানিকের মর্যাদা। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে দেবতা আর অপদেবতার কথায় মশগুল হয়ে আগেকার আমলের কোনো পুরোহিতের পক্ষেই এ-মর্যাদা পাওয়া সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে আজকের দিনে বিজ্ঞান সূর্যগ্রহণের কারণ নিয়ে যা কিছু বলছে তার সঙ্গে থ্যালিসের কথা হুবহু মিলে যায়। সত্যি বলতে, দুয়ের মধ্যে ঢের ঢের তফাত। আর তফাত তো হবার কথাই। কেননা বিজ্ঞান মানে তো আর রাতারাতি সব কথা, সবকিছু, জেনে ফেলা নয়। দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ, নানানভাবে চিন্তা করতে করতে, নানানভাবে পরীক্ষা করতে করতে, বিজ্ঞান চিনতে চাইছে দুনিয়ার রহস্যকে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে।

আজকের দিনে বিজ্ঞান যতোখানি জেনেছে আগামী কাল

বিজ্ঞান তার তুলনায় ঢের বেশি জানবে। আজকের দিনে বিজ্ঞান যতোখানি জেনেছে আড়াই হাজার বছর আগে তার তুলনায় ঢের কম জেনেছিলো। বিজ্ঞান তাই আবিষ্কারের অভিযান। শেষ নেই এ-অভিযানের।

॥ ইউরোপের প্রথম দার্শনিক

এখন, এ-হেন যে পণ্ডিত—যাঁর নাম হলো কিনা থ্যালিস্—ইউরোপের ইতিহাসে তাঁর মর্যাদ আরো অনেকখানি। কেননা এঁকেই আবার বলা হয় ইউরোপের ইতিহাসে প্রথম দার্শনিক।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? থ্যালিস্ আরো কী কাণ্ড করলেন যার দরুন তাঁর এই বাড়তি খাতির? আসলে তিনি পুরো দুনিয়ার রহস্যের একটা কিনারা করতে চেয়েছিলেন। দর্শন বলতে মোটামুটি তাইই বোঝায়। তাঁর আগে পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে ওইভাবে দুনিয়ার রহস্যটাকে বোঝবার চেষ্টা আর কেউই করে নি।

কী বলেছিলেন থ্যালিস্? দুনিয়ার রহস্যের কী এমন কিনারা তিনি করে বসলেন? কেন তাঁকে বলতে যাবো ইউরোপের প্রথম দার্শনিক?

অবশ্য থ্যালিসের নিজের লেখা কোনো পুঁথিপত্র আজ আর টি ক নেই। অন্য কোনো কোনো পুরনো আমলের পণ্ডিতের লেখায় থ্যালিসের মতামত সম্বন্ধে ছুটকো-ছাটকা খবর পাওয়া যায়। আর ওই ধরনের খুচরো খবরের ওপর নির্ভর করেই তাঁকে বলা হয় ইউরোপের প্রথম দার্শনিক।

এ-জাতীয় খবরের মধ্যে প্রধান হলো একটি কথা। থ্যালিস্ না কি বলতেন, জলই হলো পরম পদার্থ, সবচেয়ে সার সত্য। কেননা, জল থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি, আবার জলের মধ্যেই সবকিছু বিলীন হয়ে যায়। তাই সবচেয়ে আদিম বা সবচেয়ে মৌলিক জিনিস হলো জল। জলই পরম সত্য।

তুমি বলবে, কথাটা কি সত্যি নাকি? সত্যিই কি জল থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি? সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত জলের মধ্যেই সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। আজকের দিনে আমরা জানি জল একমাত্র মৌলিক পদার্থ হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি মৌলিক পদার্থ ই নয়! হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে তৈরি হয়েছে জল।

অবশ্য থ্যালিস্ এতো কথা মোটেই জানতেন না। তাঁর সময়ে কারুর পক্ষেই এতো কথা জানবার সম্ভাবনা ছিলো না। আজকালকার কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, থ্যালিসের মাথায় এই কথাটা এসেছিলো মিশর কিংবা ব্যাবিলোনের পুরোহিতদের কাছ থেকেই। অন্তত এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে থ্যালিস্ জন্মাবার ঢের আগে থাকতেই নানান দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে খানিকটা এই রকমই একটা কথা বারবার শোনা গিয়েছে,—শোনা গিয়েছে সৃষ্টির আগে ছিলো প্লাবন, জলের এই প্লাবন থেকেই সবকিছুর শুরু।

দেশ-বিদেশের পৌরাণিক উপাখ্যানে এই রকম কল্পনা এলো কেমন করে? এ-কি শুধুই সেকালের মানুষদের খামখেয়ালিপনা নাকি? তাও নয়। এর মূলে ছিলো সেকালের মানুষদের

একটি পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কিসের অভিজ্ঞতা? পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাচীন সভ্যতাই গড়ে উঠেছিলো বড়ো বড়ো নদীর কিনারায় কিনারায়—জলকে আশ্রয় করেই। কী দেখতো এ-সব সভ্যতার মানুষ? দেখতো, জলের প্লাবনে মাঝে মাঝে মুছে যায় দিগন্ত থেকে দিগন্ত। আর তারপর,—বন্যার জল সরে যাবার পর,—ওরা দেখতো কালো পলি-পড়া মাটি জেগে উঠছে! আর দেখতে দেখতে এই কালো মাটি প্রাণের প্রাচুর্যে সবুজ হয়ে উঠতো।

মোটের ওপর এই ছিলো ওদের জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আজকের দিনের মানুষ হলে না হয় এই অভিজ্ঞতাকে ভালো করে বিচার করবার,—বোঝবার,—সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু সেকালে তা থাকবার কথা নয়। সেকালের মানুষ এই অভিজ্ঞতাটিকে তাই ওইভাবেই বোঝবার চেষ্টা করতো। ভাবতো, জল থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। আবার প্রলয়ের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাচ্ছে জলের মধ্যেই! এই কথাগুলি তাই পুরোনো কালের পৌরাণিক কল্পনার মধ্যে অতোখানি জরুরী জায়গা জুড়ে ছিলো।

কিন্তু, কথা হলো, এই রকমের একটা সামান্য কথা বলবার জন্যে থ্যালিসকে অতোখানি মর্যাদা দিতে হবে কেন? কেন বলতে হবে, তিনিই ছিলেন ইউরোপের সর্বপ্রথম দার্শনিক? বিশেষত, আমরা তো দেখলাম, কথাটা এমন কিছু সত্যিও নয়, অভিনবও নয়!

প্রথম ঝোঁকে তাই মনে হয় বইকি। কিন্তু ভালো করে

ভেবে দেখলে বোঝা যাবে থ্যালিসের পক্ষে এই কথাটি মুখ ফুটে বলতে পারাটা সত্যের সন্ধানে মানুষের অভিযানে এক পরমাশ্চর্য ঘটনাই। কেন তাই দেখো।

এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ নেই যে থ্যালিসের বহু আগেই নানান দেশের নানান পুরাণে জলকেই সবকিছুর আদি-কারণ বলে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সবই হলো পৌরাণিক কাহিনী। আর পৌরাণিক কাহিনী বলেই জলের সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে জলেরই কোনো এক অধিষ্ঠাতা দেবতার। সৃষ্টি আর প্রলয়, প্রলয় আর সৃষ্টি—সবকিছুর মূলে রয়েছে জল; কিন্তু শুধু জল নয়, জলেরই সঙ্গে জলের অধিষ্ঠাতাও! সেই দেবতাই হলো আসল স্রষ্টা। ব্যাবিলোনের পুরাণ অনুসারে এই দেবতার নাম বুঝি মার্দুক। অন্য দেশের অন্য পুরাণে এর আবার অন্য রকমের নাম।

থ্যালিসের যেটা কিনা আসল প্রতিভা সেটা হলো, ওই মার্দুকের কথাটি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র জলকেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের আসল কারণ মনে করা। জল থেকেই সবকিছুর শুরু, জলের মধ্যেই সবকিছুর শেষ—কিন্তু এ হলো নিছক জল, এর সঙ্গে জলের কোনো অধিষ্ঠাতা দেবতার সম্পর্ক নেই।

তফাতটা ঠিক কোথায় তা আরো ভালো করে ভেবে দেখো। পৌরাণিক উপকথা আর থ্যালিসের দর্শন—দুয়ের মধ্যে মিল কোথায়?

প্রথমত, দুয়ের মূলেই রয়েছে পুরো দুনিয়ার একটা ব্যাখ্যা খোঁজবার চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, দুয়ের কোনোটাই নিছক খাম-

খেয়ালিপনা নয়—দুয়ের পেছনেই রয়েছে মানুষের একরকম অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এই মিল থাকা সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে রয়েছে প্রকাণ্ড তফাত? কী রকম তফাত?

পৌরাণিক কাহিনীর বেলায় যেটুকু কথা অভিজ্ঞতায় পাওয়া গেলো শুধুমাত্র সেইটুকুকে বিচার করেই দুনিয়ার ব্যাখ্যাটা দেওয়া হলো না। বরং, ওই অভিজ্ঞতাটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলা হলো দেবদেবীর কল্পনা দিয়ে। অর্থাৎ কিনা, পৌরাণিক কাহিনীর বেলায় অভিজ্ঞতাটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা নয় অভিজ্ঞতা-টাকে বিচার করবার চেষ্টা।

থ্যালিসের ব্যাখ্যার বেলায় কিন্তু একেবারেই উলটো রকম। অভিজ্ঞতাটাই বড়ো কথা, অভিজ্ঞতাটাকে বিচার করবার চেষ্টাই আসল চেষ্টা। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ যেটুকু কথা জানতে পেরেছিলো--মিশরে, ব্যাবিলোনিয়ায়, বা অন্যান্য নানা দেশে,—থ্যালিস যে শুধুমাত্র সেগুলিকে সংগ্রহ করলেন, জানলেন, তাই নয়। পৌরাণিক সংস্কার বাদ দিয়ে নির্মল বুদ্ধিতে সেগুলিকে বিচার করলেন, স্পষ্টভাবে বোঝবার চেষ্টা করলেন।

এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই যে আজকের দিনের তুলনায় প্রাচীনকালের মানুষদের ওই অভিজ্ঞতাটুকু ছিলো নেহাতই সংকীর্ণ। সেকালের মানুষ পৃথিবীর খবর কতোটুকুই বা পেয়েছিলো? কতোটুকুই বা তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো প্রকৃতি সম্বন্ধে? কতোটুকুই তারা দেখেছিলো? কতোটুকুই বা তারা বুঝেছিলো? খুব বেশি নয় নিশ্চয়ই। তাই আজকের

দিনে আমাদের জ্ঞানের তুলনায় থ্যালিসের ওই কথাটুকু নেহাতই স্থূল মনে হয়। মনেই হয় না, কথাটা খুব বেশি জ্ঞানীর মতো কথা।

তবু যে-কারণে থ্যালিসের আসল গৌরব সেই কারণটিকে মনে না রাখলে প্রকাণ্ড রকমের ভুল হয়ে যাবে।

কিসের গৌরব? সত্যের সন্ধানে মানুষের যে-অভিযান থ্যালিস্ তাতে যুগান্তর নিয়ে এলেন। মানুষের সামনে তিনি খুলে দিলেন একেবারে নতুন এক পথ।

কোন পথ? যেটুকু সম্বন্ধে মানুষের স্পষ্ট অভিজ্ঞতা হচ্ছে, সেইটুকুকেই নির্মল বুদ্ধির আলোয় বিচার করে সে পুরো দুনিয়ার একটা ব্যাখ্যা খোঁজবার চেষ্টা করবে। পৌরাণিক কল্পনার ভারে মানুষের মন আর কুঁজো হয়ে থাকবে না। নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতাকে উন্নত থেকে উন্নততর পদ্ধতিতে বিচার করতে করতে মানুষ সত্যকে চিনবে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে।

এই পথের নিশানা দিলেন বলেই ইউরোপের ইতিহাসে থ্যালিস্‌কে বলা হয় প্রথম দার্শনিক।

গ্রীক-দর্শন

তাহলে, ইউরোপের ইতিহাসে দর্শনের সূত্রপাত হলো গ্রীক যুগে।

শুরুর দিকে গ্রীক-দর্শনের চেষ্টাটা ঠিক কী রকম? অর্থাৎ কিনা, গ্রীক দর্শনের সমস্যাটা ঠিক কী রকম? আর এই সমস্যার কোন ধরনের সমাধান তাঁরা দেবার চেষ্টা করেছেন?

॥ মিলেসীয়দের কথা ॥

তুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখলে আমরা অসংখ্য রকমের জিনিস দেখতে পাই। আপাতত মনে হয় প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা জিনিস। কারুর সঙ্গে কারুরই সম্পর্ক নেই। কিন্তু ওই গ্রীক পণ্ডিতেরা সাব্যস্ত করলেন, আসল কথাটা তা নয়। ভালো করে বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে যে এই অসংখ্য জিনিসের মূলে একই সত্য রয়েছে। সেইটেই তাঁদের মতে হলো পরম সত্য। আমরা এতো যে অসংখ্য জিনিস দেখছি তা সবই শেষ পর্যন্ত ওই পরম সত্যের বিকাশ-মাত্র। তাহলে তাঁদের কাছে প্রধান সমস্যা ওই পরম সত্যটিকেই আবিষ্কার করবার চেষ্টা। কিসের থেকে তুনিয়ার এই অসংখ্য জিনিসের উৎপত্তি হয়েছে?

থ্যালিস্ বললেন, সেই পরম সত্য হলো জল: জল থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি, জলের মধ্যেই সবকিছু শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়।

অ্যানাক্সিমেণ্ডার বলে থ্যালিসের এক শিষ্য ছিলেন। তিনি কিন্তু গুরুদেবের এই কথাটির সঙ্গে সায় দিতে পারলেন না। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি সাব্যস্ত করলেন, জলকেই পরম সত্য মনে করাটা ভুল হবে। কেননা, শুরুতে জল ছিলো না। তার বদলে ছিলো প্রকৃতির এক প্রলয় অবস্থা: তার কোনো আদি নেই, সীমা নেই, গড়ন নেই, কিছু নেই। অব্যক্ত, অচেতন, সীমাহীন, রূপহীন, নির্বিকার প্রকৃতি। তার থেকেই ক্রমে-ক্রমে রূপে-রসে, শব্দে-গন্ধে সমৃদ্ধ এতো অসংখ্য জিনিস সৃষ্ট হয়েছে।

এইখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে যে অ্যানাক্সিমেণ্ডার

যদিও থ্যালিসের মতো জলকেই পরম সত্য বলে স্বীকার করেন নি তবুও একদিক থেকে থ্যালিস্-এর মতের সঙ্গে তাঁর মতও হুবহু এক রকমের। জগৎস্থষ্টির জন্যে তিনিও কোনো স্রষ্টার, কোনো দেবতার কথা কল্পনা করেন নি। তাঁর মতেও জড়বস্তু থেকেই সব কিছুর জন্ম—কেবল এই জড়বস্তুটা জল নয়, তার বদলে প্রকৃতির এক সীমাহীন রূপহীন আদিম প্রলয় অবস্থা।

অ্যানাক্সিমেণ্ডারের পর অ্যানাক্সিমেনিস। তিনি বললেন : জলও নয়, আদিম ও নির্বিকার প্রকৃতিও নয়। তার বদলে হাওয়া। বায়ু। বায়ুই পরম সত্য। কিন্তু এই বায়ুও জড়বস্তু। আধ্যাত্মিক কিছু নয়। অলৌকিক কিছু নয়।

এইখানেই শেষ হলো গ্রীক দর্শনের প্রথম পর্ব। এই পর্বের যে-তিনজন দার্শনিকের নাম করলাম তাঁরা সবাই ছিলেন মিলেটাস শহরের লোক। তাই গ্রীক দর্শনের প্রথম পর্বের নাম দেওয়া হয় মিলেসীয় পর্ব।

॥ পিথাগোরপন্থীদের কথা ॥

প্রথম যুগটার পর কিন্তু দেখা গেলো গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারা মিলেসীয়দের পথ ছেড়ে নতুন পথে চলতে শুরু করেছে! মিলেসীয়দের বেলায় পরস্পরের মধ্যে যতো তফাতই থাক না কেন, মোটের উপর একটি বিষয়ে মিল ছিলো : তাঁরা সকলেই এই মূর্ত জড়জগৎটাকে সত্যি বলে মেনেছিলেন এবং এর মূলে জড় প্রকৃতিরই কোনো একটি দিককে চরম সত্য মনে করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পর যাঁরা কিনা গ্রীকদর্শনের আসর জাঁকিয়ে বসলেন

তাঁদের বেলায় দেখা গেলো এই মূর্ত জড় পৃথিবীটাকে অমন সত্য মনে করবার দিকে আর ঝোঁক নেই। তার বদলে তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন, চোখকান দিয়ে দেখেশুনে যেটুকু কথাকে সত্য মনে হচ্ছে তার চেয়েও ঢের বড়ো সত্য হলো শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে, শুধুমাত্র বুদ্ধির চর্চা করে, যে কথাটাকে সত্যি মনে হচ্ছে সেই কথাটাই। তার মানে, দার্শনিক মহলে চোখে-দেখার ওপর আস্থাটা যেন কমে যেতে লাগলো ; তার বদলে দেখা দিলো শুধু বুদ্ধিখাটানোর ওপর আস্থা। ফলে এই দ্বিতীয় যুগের গ্রীক দর্শন ক্রমশই অবাস্তব হয়ে পড়তে লাগলো।

কথাটাকে আর একটুখানি খুলে বলা দরকার।

মাথা খাটানো কি ছোটো কথা ? বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সত্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টাটা কি ভুল চেষ্টা ? নিশ্চয়ই নয়। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সত্যের সন্ধানে অভিযানে মানুষের মস্ত বড়ো সহায় হলো তার বুদ্ধি। তার মাথা খাটাবার শক্তি। কিন্তু আমি যদি মনে করি, চোখকান বন্ধ করে শুধুমাত্র মাথা খাটিয়েই সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবো,—কিংবা আমি যদি মনে করি পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাটা একেবারেই কাজের কিছু নয়, তার বদলেই শুধু বুদ্ধি খাটিয়েই বা মাথা ঘামিয়েই আমি চরম সত্য আবিষ্কার করতে পারবো,—তা হলে আমার চেষ্টাটা একপেশে হয়ে যাবে না কি ?

বুদ্ধিকে ছোটো করবার দরকার নেই। কিন্তু বুদ্ধিকে বড়ো করতে গিয়ে চোখের দেখাকে যদি ছোটো করে বসি তাহলে নিশ্চয়ই ভুল হবে, তালকানার মতো হবে।

গ্রীক-দর্শনের দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় পণ্ডিতদের চেষ্টাটা ক্রমশই এই রকম তালকানার মতো, বা একপেশে, হয়ে যেতে লাগলো।

মিলেসীয়দের পর পিথাগোরপন্থীদের কথা। পিথাগোর-পন্থী মানে? মানে হলো, কোনো একজন পণ্ডিত নয়, তার বদলে দার্শনিকদের একটা দল বা সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি কিনা প্রধান বা গুরুদেব তাঁরই নাম পিথাগোরাস। তাঁর নাম থেকেই দলটার ওই রকম নামকরণ করা হয়।

এঁরা কী বলতেন-না-বলতেন সে-কথা তোলবার আগে এঁদের হালচালটার কথা একটুখানি বলে নেওয়া ভালো। হালচালের দিক থেকে মিলেসীয়দের সঙ্গে পিথাগোরপন্থীদের মস্ত তফাত ছিলো। মিলেসীয়রা ছিলেন কর্মমুখর শহরের কর্মব্যস্ত মানুষ; থ্যালিসের জীবনী সম্বন্ধে যেটুকু টুকরো-টাকরা খবর পাওয়া যায় তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় সওদাগরিতে সরগরম ওই মিলেটাস শহরটিতে তিনি নিজে একজন প্রধান সওদাগর ছিলেন। ঘরকুনো কূঁড়ের বাদশা মোটেই নন, সওদাগরি নিয়ে পাড়ি দিতেন এ-দেশ থেকে ও-দেশ,—মিলেটাস থেকে মিশর, মিশর থেকে মেসোপটেমিয়া।

এইজন্যেই, জীবনের সঙ্গে যোগ ছিলো মিলেসীয় দার্শনিকদের।

পিথাগোরপন্থীদের বেলায় কিন্তু একেবারেই অন্য রকম। তাঁরা সাধারণ বা স্বাভাবিক জীবন থেকে সরে এসে নিজেদের জন্যে আলাদা মঠ তৈরি করতে লাগলেন। ওই মঠে বসে মাথা ঘামিয়ে তাঁরা সত্যকে আবিষ্কার করতেন। তাঁদের এই যে সত্য-

সন্ধান এটা নেহাতই গোপন বা গুহ্যবিদ্যা হয়ে দাঁড়ালো। সাধারণ জীবন থেকে ওইভাবে সরে এলেন বলেই তাঁদের কাছে সাধারণ জীবনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাটা আর তেমন বড়ো কথা হয়ে রইলো না। এমন কি, তাঁরা যে-সব কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন হঠাৎ শুনলে সেগুলোর কোনো মানে বোঝা যায় না, মনে হয় হেঁয়ালির মতো।

কী রকমের কথাবার্তা? যেমন ধরো, পিথাগোরপন্থীরা বলতে শুরু করলেন, সংখ্যাই হলো পরম সত্য, চরম সত্তা। তার মানে? মানে যে সত্যিই কী, সে-কথা নিশ্চয়ই খুব জোর গলায় বলবার জো নেই। পিথাগোরপন্থীদের টুকরো-টাকরা লেখা, বা তাঁদের সম্বন্ধে প্রাচীনকালের অন্যান্য পণ্ডিতদের লেখা যেটুকু কথাবার্তা পাওয়া যায় তা দুর্বোধ্য এবং প্রায়ই রহস্যময়। তবু আজকালকার কোনো কোনো পণ্ডিত অনেক মাথা ঘামিয়ে, অনেক ভেবে-চিন্তে, এঁদের কথাবার্তাগুলোর একটা তাৎপর্য দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন।

কী ধরনের তাৎপর্য? বলছি শোনো। কিন্তু শুধু শুনলেই হবে না। রীতিমতো মাথা ঘামিয়ে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথমত ভেবে দেখো, সংখ্যা বলে কিছু কি চোখে দেখা যায়, বা, কানে শোনা যায়? কিংবা, যা একই প্রশ্ন, সংখ্যা সম্বন্ধে কি আমাদের কোনো রকমের অভিজ্ঞতা হতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। ধরো, আমি দুটো গোরু দেখলাম, বা, চারজন মানুষ দেখলাম। কী দেখলাম? গোরু বা মানুষ। কিন্তু শুধুমাত্র 'দুই', বা, শুধুমাত্র 'চার' বলে কিছু দেখা কি আমার পক্ষে সম্ভবপর? নিশ্চয়ই নয়।

কাগজে আঁচড় কেটে যখন লিখছি '২' বা '৪' তখন কিন্তু ওগুলো আসল দুই বা আসল চার বলে সংখ্যা নয়—সংখ্যার চিহ্নমাত্র। যেমন, কাগজে একটা বড়ো দাঁড়ি টেনে যদি বলি 'ধরো, এটা একটা বেড়াল' আর তার পাশে অন্য একটা দাঁড়ি টেনে যদি বলি 'ধরো, এটা একটা ইঁদুর'—তাহলে তো আর ওই দাঁড়িগুলোই সত্যিকারের বেড়াল কিংবা সত্যিকারের ইঁদুর হয়ে যাবে না। তার বদলে হবে বেড়ালের চিহ্ন কিংবা ইঁদুরের চিহ্ন। তেমনি, কাগজের ওপর ২ লিখলে সেটাই আসল সংখ্যা হবে না, হবে আসল সংখ্যার একটা চিহ্ন। আবার অন্য রকম চিহ্নও হতে পারতো : 2, II কিংবা ২ 1 কিংবা ধরো '৪' চিহ্নটার কথা। এটা কিসের চিহ্ন ? আমাদের মতে 'চার' বলে সংখ্যার, সাহেবদের মতে আট বলে সংখ্যার। তার মানে ওইটাই কোনো সংখ্যা নয়—সংখ্যা বোঝাবার জন্যে একটি চিহ্নমাত্র।

আঁক কষবার সময় আমরা সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু সংখ্যাকে কোনোমতেই চোখে দেখবার উপায় নেই। তাই সংখ্যাগুলোকে বোঝাবার জন্যে আমরা এক-একটা চিহ্ন ব্যবহার করি। এক-এক দেশে এক-এক রকমের চিহ্ন।

আর যদি তাই হয় তাহলে সংখ্যাগুলোকে ভারি মজার ধরনের জিনিস বলতে হবে। এগুলোকে চোখে দেখা যায় না, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। তবুও এগুলোকে নিয়ে মাথা খাটানো যায়, ভাবা যায়, চিন্তা করা যায়।

এইবার বুঝে দেখো, কেউ যদি বলেন সংখ্যাই হলো সবচেয়ে চরম সত্য তাহলে তাঁর কথাটার তাৎপর্য কী রকম হবে ?

পৃথিবীর দিকে চেয়ে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা কিছু জানা যাচ্ছে তা আসল সত্য নয়। আসল সত্যকে জানতে হলে অভিজ্ঞতাকে খাটো করে, বর্জন করে, শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে, শুধুমাত্র চিন্তা করে তবেই এগুবার চেষ্টা করতে হবে। ইন্দ্রিয় দিয়ে পৃথিবীর যে-অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে সেইটাই আসল সত্য নয়। বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে—শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে—তুনিয়াকে তুমি যদি বোঝবার চেষ্টা করো তাহলেই আসলে বোঝা সম্ভবপর হবে। আর এই কারণেই,—অভিজ্ঞতাকে ওইভাবে ছোটো করলেন বলেই,—পিথাগোরপন্থীদের মতবাদ একপেশে হতে হতে শেষ পর্যন্ত প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়ালো। যেমন ধরো, তাঁদের মধ্যে কেউবা বললেন, ন্যায় =৪, কেউবা বললেন ন্যায় =৫, বা ওই রকম আরো অনেক কথা।

সত্যের সন্ধান পাওয়া তো দূরের কথা, এই রকমের রহস্যময় পাটিগণিতের কোনো রকম মাথামুণ্ড হয় কিনা তাই বুঝতে পারাই আমাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে!

॥ **ইলিয়াটিকদের কথা** ॥

কাজের মানুষ তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে পৃথিবীকে জানছে তার কথা গ্রীক দার্শনিকদের হুঁশ থেকে ক্রমশই যেন মুছে যেতে লাগলো। পিথাগোরপন্থীদের পর যাঁরা গ্রীক-দর্শনের আসর জমিয়ে বসলেন তাঁদের বলা হয় ইলিয়াটিক। কেননা, তাঁরা ছিলেন ইলিয়া শহরের বাসিন্দা। ইলিয়াটিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নামডাক হলো তিনজন দার্শনিকের: জেনোফেনিস্,

পারমানাইডিস্ আর জেনো। এদের যেটা বলবার কথা তার সূত্রপাত করলেন, পারমানাইডিস্। সেই কথাটাকেই আরো ভালো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ব্যাখ্যা করলেন জেনোফেনিস্, আর জেনো সেই কথার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি-তর্ক আবিষ্কার করলেন।

বলবার কথাটা ঠিক কী? এক কথায়, পৃথিবীটা মায়া বা মিথ্যা। পরম সত্য হলো নির্গুণ ও অদ্বিতীয়।—আমাদের দেশের কোনো কোনো দার্শনিক যেমন বলতেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—অনেকটা সেই রকমের কথাই। তাহলে দেখতেই পাচ্ছো, অভিজ্ঞতায় জানা জগৎটাকে খাটো করবার যে-চেষ্টা পিথাগোর-পন্থীদের মধ্যে ফুটে উঠেছিলো তারই কী রকম চূড়ান্ত পরিণতি হলো ইলিয়াটিকদের দর্শনে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, জগৎটাকে ওঁরা একেবারে মিথ্যে বা মায়া বলে প্রমাণ করতে চাইলেন কীভাবে? ওঁদের কথার পক্ষে যুক্তিগুলো কী রকম? তার পরিচয় পাওয়া যায় এই দলের কনিষ্ঠ দার্শনিকটির মধ্যে। তাঁর নাম জেনো।

জেনো বললেন, ভালো করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, জগৎটাকে মিথ্যে না বলে উপায় নেই। আমরা বলবো, ভালো করে ভেবে দেখা মানে কী? জেনো বললেন, দু-একটা নমুনা দেখো, দেখলেই কথাটা বুঝবে।

পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের যে-অভিজ্ঞতা তার একটা মূল কথা হলো গতি বা পরিবর্তন। জিনিসগুলো নড়ছে চড়ছে, বদলাচ্ছে বাড়ছে, জন্মাচ্ছে, মরছে। এরই নাম গতি, এরই নাম পরিবর্তন। খরগোসটা ছুটে গেলো এদিক থেকে ওদিকে। স্বচক্ষে দেখলাম।

কী দেখলাম? গতি। কচি ছেলে বড়ো হলো, বুড়ো হলো। স্বচক্ষে দেখলাম। কী দেখলাম? পরিবর্তন। অদলবদল।

জেনো বলবেন, স্বচক্ষে তো দেখলাম। কিন্তু চোখে দেখলেই তো আর হলো না। ভেবে দেখাও দরকার। মাথা খাটিয়ে, বুদ্ধি খরচ করে বোঝবার চেষ্টা করা দরকার: যা দেখলাম তা সত্যি, না, মিথ্যে?

আর ভাবতে শুরু করলেই বুঝতে পারা যাবে যে চোখে দেখা সত্ত্বেও ওই গতি বা পরিবর্তন বলে ব্যাপারটি সত্যি হতে পারে না। স্বচক্ষে দেখা গতি বা পরিবর্তনের কয়েকটি নমুনার বিচার করছেন জেনো। আর তিনি প্রমাণ করে দিতে চাইছেন যে ওইভাবে বিচার করলেই বোঝা যায় এগুলিকে সত্যি বলে মানবার জো নেই।

ধরো, ধনুক বাগিয়ে কেউ একটা তীর ছুঁড়লো। কী দেখলাম? সন্‌সন করে তীরটা ছুটে চললো। কী গতি! কথায় বলে, তীর-বেগ। কিন্তু, জেনো বললেন, ভেবে দেখতে হবে, এই যে গতি বা বেগ বা পরিবর্তন স্বচক্ষে দেখছি এটা সত্যি হতে পারে কি না? তাঁর যুক্তি অনুসারে পারে না। কেননা—

যে-সময়টা ধরে তীরটাকে ছুটে চলতে দেখছো সেই সময়টাকে কয়েকটি মুহূর্তে ভেঙে নাও। তারপর ধরো সেই মুহূর্তগুলির মধ্যে যে-কোনো একটা মুহূর্তের কথা। মানতেই হবে, ওই মুহূর্তে তীরটা নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো জায়গায় রয়েছে। কিন্তু শুধুই কি তাই? তীরটা কি শুধুই ওই মুহূর্তে ওই জায়গায় আছে নাকি? যদি শুধু তাই হতো তাহলে তীরটা

তার পরের মুহূর্তে তার পরের জায়গায় যাবে কেমন করে? তার মানে, এই মুহূর্তে তীরটা যখন এই জায়গায় রয়েছে তখনই,—অর্থাৎ কিনা সেই মুহূর্তেই—ওই জায়গা ছেড়ে তার পরের জায়গায় চলে যাচ্ছে। তা যদি না যেতো, ঠিক তার পরের মূহূর্তে তীরটা তার পরের জায়গায় পৌঁছতে পারতো না।

তাহলে একই সঙ্গে দুটো কথা মানতে হয়। এই মূহূর্তে তীরটা এ-জায়গায় রয়েছে আবার এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া মানেই হলো এ-জায়গায় আর না-থাকা। তার মানে তুমি যদি গতিকে সত্যি বলে স্বীকার করতে যাও তাহলে তোমায় বলতে হবে এই মূহূর্তে তীরটা এই জায়গায় আছে আবার নেইও।

এখন 'আছে' আর 'নেই'—এই দুটো কথার মধ্যে বিরোধ রয়েছে। একটা আর একটাকে নাকোচ করে দেয়। দুটো কথার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে।

তাহলে, গতিকে সত্যি বলে মানতে যাওয়া মানেই দুটো বিরুদ্ধ কথাকে,—দ্বন্দ্বশীল দুটো কথাকে—একই সঙ্গে সত্যি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হওয়া। কিন্তু, জেনো বললেন, তা তো আর সত্যিই সম্ভবপর নয়। আর তা সম্ভবপর নয় বলেই গতিকে সত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

গতি বা পরিবর্তন যে সত্যি হতে পারে না, এই কথাটি বোঝাবার জন্যে জেনো আরো যুক্তি দেখিয়েছেন। আর শুধু গতিই বা কেন? জগতের দিকে চেয়ে দেখলে আমরা নানা

ধরনের জিনিস দেখতে পাই, দেখতে পাই বহু, বিচিত্র ধরনের জিনিস। এখন এই যে বহুত্ব, নানাত্ব, বৈচিত্র্য—একি সত্যি না কি ? যুক্তি দিয়ে জেনো প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন তাও নয়। কেননা, নানা-কে সত্যি বলে মানতে গেলেও আমরা বিরুদ্ধ দুটো কথাকে একই সঙ্গে স্বীকার করে বসতে বাধ্য হবো।

এদিকে কিন্তু গতি আর বৈচিত্র্যই হলো অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা জগৎটার মূল কথা। তাই এই দুটোই যদি ঝুটো হয় তাহলে অভিজ্ঞতার সাহায্যে জগৎটাকে আমরা যে-ভাবে জানছি তাও ঝুটো বলে মানতে আমরা বাধ্য।

ইলিয়াটিকদের মতে তাই জগৎ মিথ্যে, জগৎ ঝুটো, জগৎ মায়া।

জগৎ যদি ঝুটো হয় তাহলে সত্যি কী ? এমন কিছু যা এক, —যার সঙ্গে বহুত্ব বা বৈচিত্র্যর কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কিছু যার পরিবর্তন নেই, যার সঙ্গে গতির কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ কিনা, আমাদের দেশের কোনো কোনো দার্শনিক যে-রকম বলেছেন—নির্গুণ, নির্বিকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য —অনেকটা সেই রকম কথাই।

॥ **হেরাক্লাইটাস** ॥

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? সত্যিই কি গতি মিথ্যা, ঝুটো এই এই জগৎ—যে-জগৎকে কিনা আমরা স্বচক্ষে দেখছি ?

আর একজন জ্ঞানী বললেন, তা নয়। ইলিয়াটিকদের ওই কথাবার্তাগুলো একেবারেই ভুল।

নাম তাঁর হেরাক্লাইটাস। সত্যের সন্ধানে এগিয়ে ইলিয়াটিকেরা অবাস্তব এক কল্পনায় পৌঁছেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন হেরাক্লাইটাস।

হেরাক্লাইটাস বললেন, আমার গুরু আমার চোখ, আমার কান। জ্ঞান যদি পেতে চাও তাহলে তোমার চোখ খোলা রাখো, কান খাড়া রাখো। প্রকৃতির কণ্ঠস্বর শুনেই প্রকৃতির রহস্যকে জানতে হবে। কিন্তু শুধু শুনলেই তো হবে না, ভালো করে বুঝতে পারাও দরকার। চোখ-কানের সাক্ষীকে তো আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু মন যদি তোমার সজাগ না থাকে তাহলে চোখ-কানের সাক্ষ্যটা তোমার কাছে ধরাই পড়বে না। প্রকৃতির কাছ থেকেই তার রহস্য জানবো ; কিন্তু প্রকৃতি যেন এই রহস্য গোপন করে রাখতে চায়—আমরা শিখবো তা উদ্ঘাটন করতে।

জ্ঞানের কথা শোনবার জন্যে যারা হেরাক্লাইটাসের কাছে যেতো, হেরাক্লাইটাসের কথা শুনতে শুনতে তারা অবাক হয়ে যেতো, স্তম্ভিত হয়ে যেতো। খানিকটা বুঝতো, খানিকটা বুঝতো না। সাধারণ লোক যে-ভাবে ভাবে, যে-কথা বলে, হেরাক্লাইটাস্ যেন সে-ভাবে ভাবছেন না, সে-সব কথা বলছেন না। সাধারণ লোকের সাধারণ ধারণাগুলোকে তিনি যেন একেবারেই ওলট-পালট করে দিতে চান। আপন মনে কী সব তিনি লেখেন,—যা লেখেন তা বুঝতে পারা কঠিন। পাণ্ডুলিপিগুলো গোল করে পাকিয়ে দেবী আর্টেমিস্-এর মন্দিরে তিনি তুলে রেখে দেন। বলেন, এ নিয়ে অনেক কথা ভাবতে

হবে। যারা ভাববে তারা বুঝবে।

প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখো, হেরাক্লাইটাস বলে চলেন, ভালো করে চোখ খুলে দেখতে হবে, মন দিয়ে বুঝতে হবে। ভালো করে দেখো, দেখবে চারদিকে অবিরাম অনন্ত স্রোত! স্রোত ছাড়া আর কী? প্রতি মুহূর্তেই সবকিছু বদলে যাচ্ছে। যা ছিলো তা আর থাকছে না। যা আছে তা আর থাকবে না। শুধু গতি আর গতি, শুধু পরিবর্তন—অনন্ত এই পরিবর্তনের বন্যায় ভেসে চলেছে পৃথিবী।

তুমি বলবে, ওই তো—ওখানে নদী রয়েছে। প্রতিদিন তুমি নদীতে নাইতে যাচ্ছো। একই নদী—সেই নদীই যা কাল ছিলো, সেই নদীই যা কালও থাকবে। হেরাক্লাইটাস বললেন, কোথায় সেই নদী? বলবেন, চোখ খুলে দেখো, মন দিয়ে ভাবো—বুঝতে পারবে একই নদীতে তুমি দু বারও ডুব গালতে পারো না। যে-জলে ডুব গাললে সে-জল তো বয়ে চলে গেলো। ডুব গেলে উঠতে-না-উঠতে তুমি দেখবে নদীটা আর সে-নদী নেই! বদলে গিয়েছে। অন্য নদী হয়ে গিয়েছে। তাই একই নদীতে তুমি দু বার ডুব গালতে পারো না। প্রতি মুহূর্তেই নদীটা বদলে যাচ্ছে। নতুন নদী হয়ে যাচ্ছে।

হেরাক্লাইটাস বললেন, চোখ খুলে দেখো, মন দিয়ে বোঝো—দেখবে সবকিছুই ওই নদীর মতোই। এমন কি আকাশের ওই যে সূর্য—প্রতিদিন ভোরবেলাতেই নতুন সূর্য—একই সূর্য নয়।

হেরাক্লাইটাস বললেন, দুনিয়ার কিছুই স্থির নয়। শান্তি

নেই, বিশ্রাম নেই—কোথাও না। চোখ খুলে দেখো। মন দিয়ে বোঝো। দেখবে সংগ্রাম আর সংগ্রাম। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। অবিরাম অনির্বাণ সংগ্রাম। অবিরাম দ্বন্দ্ব। প্রতিটি জিনিসের মধ্যে, প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক মুহূর্তে। জন্ম আর মৃত্যু, মৃত্যু আর জন্ম। অবিরাম। অনির্বাণ। প্রতিটি জিনিসের মধ্যে, প্রত্যেক জায়গায়, প্রতি মুহূর্তে। একদিকে জন্ম আর একদিকে মৃত্যু। জন্মমৃত্যুর অবিরাম দ্বন্দ্ব প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি জিনিসের মধ্যে।

তাই স্থির বলে কিছু নেই। শান্ত বলে কিছু নেই। কোথাও নয়। বরং, আগুনের শিখার মতো। এই আগুনের শিখা দিয়েই সবকিছু গড়া। আগুন আর আগুন। মাঝে মাঝে সেই শিখা যেন লখলখ করে উঠেছে, মাঝে মাঝে আসছে স্তিমিত হয়ে।

হেরাক্লাইটাস বলে চলেন, সবই ওই আগুন আর আগুন। আগুন থেকেই জল, আগুন থেকেই বাতাস, আগুন থেকেই পৃথিবী। আগুনের শিখাটার দিকে চেয়ে দেখো। গত মুহূর্তে যে-শিখা ছিলো এ-মুহূর্তে তার আর চিহ্ন নেই। এই মুহূর্তে যে-শিখা রয়েছে আগামী মুহূর্তে তার আর চিহ্ন থাকবে না। আগুনের শিখা প্রতি মুহূর্তেই মরে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই আবার নবীন হয়ে জন্মাচ্ছে। তাই তার একদিকে জন্ম, আর একদিকে মৃত্যু। এই জন্মমৃত্যুর দ্বন্দ্বই আগুনের শিখায়। আর শুধু আগুনের শিখাই নয়। সবই ওই রকম। সবই শুধু আগুনের শিখা।

যারা তাঁর কাছে জ্ঞানের কথা শুনতে এসেছিলো, হেরাক্লাইটিসের কথা শুনতে শুনতে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিছুটা তারা বুঝতে পারে, কিছুটা পারে না। বিদায় নিয়ে তারা যখন ফেরে এখন তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে আগুনের শিখা —কখনো লখ লখ করে উঠছে, কখনো স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, এ-শিখা নিয়ত নবীন। তাদের কানে বাজতে থাকে শুধু একটি কথা : চোখে খুলে দেখো, মন দিয়ে বোঝো। দেখবে শুধু গতি আর গতি। শুধু জন্ম আর মৃত্যু। শুধু দ্বন্দ্ব আর সংগ্রাম। সনাতন বলে কিছু নেই, শান্ত বলে কিছু নেই, বিশ্রাম বলে কিছু নেই।

॥ গতি আর স্থিতি। সত্য আর সনাতন ॥

ইলিয়াটিকদের কথা কিছুটা বড়ো করে আলোচনা করলাম। হেরাক্লাইটাসের কথা কিছুটা বড়ো করে বললাম। গ্রীক দার্শনিকদের প্রত্যেকের কথা এতোখানি বড়ো করে বলবার সুযোগ পাবো না। তবু এই দুটি মতবাদের কথা বড়ো করে বলবার দরকার ছিলো। কেননা, পরের যুগে দর্শনের ইতিহাসে যে সমস্যাটা প্রকাণ্ড বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে তাকে ভালো করে বোঝবার জন্যে ইলিয়াটিকদের সঙ্গে হেরাক্লাইটাসের তফাতটা ভালো করে বোঝা দরকার।

সমস্যাটা কী? স্থিতি সত্য, না, গতি সত্য? সত্য কি সনাতন, না, নিয়ত পরিবর্তনশীল?

ইলিয়াটিকরা কী প্রমাণ করতে চাইলেন? গতি বা পরিবর্তন

সত্য হতে পারে না। আমরা দেখছি বটে, দুনিয়া বদলাচ্ছে। কিন্তু এই দেখাটা নেহাতই দেখার ভুল। ভুল দেখা। ঠিক, মতো যদি চিন্তা করতে পারো তাহলে বুঝবে গতি বা পরিবর্তন বলে যা দেখছো তা নেহাতই ঝুটো, নেহাতই মিথ্যে। কেন ঝুটো? কেননা, ওকে সত্যি বলে স্বীকার করতে গেলে দুটো বিরুদ্ধ কথাকে, দ্বন্দ্বমূলক দুটি ধারণাকে, একই সঙ্গে সত্যি বলে মেনে নিতে হয়। 'আছে' আর 'নেই'—দুটি কথাই সত্যি। একই সঙ্গে সত্যি, একই বিষয় সম্বন্ধে সত্যি—এমনতরো কথা বলবার উপায় আছে নাকি? কী করে থাকবে? একটা কথা যে অপরটাকে নাকোচ করে দেয়।

আর হেরাক্লাইটাস কী বললেন? ঠিক এর উলটো কথা। বললেন গতিই পরম সত্য। সনাতন বলে তোমার যে ধারণা তা নেহাতই ঝুটো, নেহাতই ভুল ধারণা। ভুল কেন? হেরাক্লাইটাস বললেন, চোখ খুলে দেখো, মন দিয়ে বোঝো—প্রকৃতির কণ্ঠস্বর শুনেই প্রকৃতির রহস্যটা আবিষ্কার করতে হবে। প্রকৃতির দিকে ঠিকমতো চেয়ে দেখলে কী দেখতে পাবে? দেখবে, অবিরাম, অনির্বাণ গতি। নদীর স্রোতের মতো। আগুনের শিখার মতো। কিন্তু ইলিয়াটিকদের ওই যুক্তিটার কী হলো? গতিকে মানতে হলে যে দুটো বিরুদ্ধ কথাকে একই সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। হেরাক্লাইটাস বললেন, তা তো হবেই। কেননা ওই বিরোধটাই যে সত্য, দ্বন্দ্বই যে সত্য, সত্য শুধু জন্ম-মৃত্যুর অবিরাম সংগ্রাম।

তাহলে গতি সত্য, না, স্থিতি সত্য?

এর পরের যুগটায় তিনজন জ্ঞানী দর্শনের এই সমস্যাটারই সমাধান দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের নাম এম্‌পিডোক্লিস, ডিমোক্রিটাস, অ্যানাক্সাগোরাস। একদিক থেকে বলা যায়, এঁদের চেষ্টার মূল উৎসাহ হলো ইলিয়াটিকদের আর হেরাক্লাইটাসের মতবাদের মধ্যে একটা সঙ্গতি নিয়ে আসা। ইলিয়াটিকরা বলেছিলেন, স্থিতিই সত্য। হেরাক্লাইটাস বলেছিলেন, গতিই সত্য। এই তিন জন দার্শনিক দেখাতে চাইলেন, গতি আর স্থিতি দুইই সত্য। তার মানে, গতিকেও ঝুটো বলা চলবে না, স্থিতিকেও নয়। দুয়ের ধারণা মেলাতে পারলে পরই সত্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে।

কী করে মেলানো যায়? একের পর এক তিনজন দার্শনিক তিন রকমের চেষ্টা করলেন। কী রকম চেষ্টা? প্রথমে তাই দেখা যাক। তারপর আলোচনা করা যাবে সত্যিই কি তাঁরা স্থিতি ও গতির সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন?

প্রথমে এম্‌পিডোক্লিস। তিনি বললেন, দুনিয়ার সবকিছুর মূলে রয়েছে চার রকম মৌলিক পদার্থ: ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ: মাটি, জল, আগুন, বাতাস। এগুলির জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তাই এগুলিকে সনাতন বলতে হবে। কিন্তু তাই বলে, সনাতনকে স্বীকার করা হলো বলেই কি গতিকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া দরকার? তাও নয়। কেননা, এম্‌পিডোক্লিসের

মতে এই সনাতন পদার্থগুলি ছাড়াও সৃষ্টির মূলে রয়েছে দু রকম শক্তি: প্রেম ও ঘৃণা, মিলন ও বিচ্ছেদ, মৈত্রী ও দ্বন্দ্ব। আদিম পদার্থগুলির মধ্যে এই দু রকম বিরুদ্ধ শক্তি গতির সঞ্চার করে। ফলে ওই চার রকম আদিম পদার্থ নানান রূপ নেয়। অবশ্য, প্রেম ও ঘৃণা নামের দু রকম শক্তি বলতে এম্‌পিডোক্লিস যে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে ঠাহর করা কঠিন। তাঁর যে-সব টুকরো-টাকরা কথাবার্তা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় শক্তি দুটির কথা যেন চোদ্দ আনাই কবির কল্পনা, পুরাণের উপাখ্যান।

তারপর ডিমোক্রিটাস। তিনি বললেন, চার রকমের আদিম পদার্থ নয়। তার বদলে অসংখ্য পরমাণু। অবশ্যই এই পরমাণুগুলি অজর, অমর, সনাতন। কিন্তু এই দুনিয়া কি শুধুই ওই অসংখ্য পরমাণুর স্তূপ? তাও নয়। কেননা, পরমাণুগুলির মধ্যে যদিও কোনো পরিবর্তন নেই তবুও তাদের সম্পর্কের মধ্যে নানারকম অদলবদল চলেছে। পরমাণুদের মধ্যে এক-এক রকম সম্পর্কর দরুন এক-এক রকম জিনিস। আমরা দেখি, এক জিনিস বদলে আর এক জিনিস হলো। অর্থাৎ কিনা, পরমাণুদের এক সম্পর্ক বদলে আর-এক সম্পর্ক দেখা দিলো। কী করে তা সম্ভব হলো? কী করে বদলালো পরমাণুদের সম্পর্ক? ডিমোক্রিটাস বললেন, এর মূলে রয়েছে একটি শক্তি। তার নাম নিয়তি। তাহলে, এম্‌পিডোক্লিসের সঙ্গে ডিমেক্রিটাসের আসল তফাত কোথায়? এম্‌পিডোক্লিসের ওই চার রকম আদিম পদার্থের কথা শুধরে ডিমোক্রিটাস বলছেন

অসংখ্য পরমাণুর কথা। এম্‌পিডোক্লিসের প্রেম ও ঘৃণা নামের দু রকম শক্তির কথা শুধরে ডিমোক্রিটাস বলছেন একটি শক্তির কথা : নিয়তি বা অনিবার্যতা। কিন্তু একদিক থেকে দুয়ের মধ্যে তফাত খুব বেশি নয়। কেননা মূল চেষ্টাটা একই : সনাতনের সঙ্গে গতিকে মেলাবার চেষ্টা।

ডিমোক্রিটাসের পর অ্যানাক্সাগোরাস। তাঁর আসল চেষ্টাও ওই একই রকম। স্থিতির সঙ্গে গতিকে মেলাতে হবে। কিন্তু সমাধান হিসেবে তিনি যা বললেন তা অন্য ধরনের কথা। চার রকম আদিম পদার্থও নয়, অসংখ্য পরমাণুও নয়। তার বদলে, শুরুতে ছিলো অব্যক্ত প্রকৃতি। মাটি, জল, আগুন, বাতাসের মতো স্থূল নয়। তার মধ্যে চেতনার লক্ষণ নেই। আর, শুধু এই অব্যক্ত প্রকৃতিই নয়। তার পাশেই ছিলো আর এক সত্য। অ্যানাক্সাগোরাসের ভাষায়, তার নামে নউস। দুনিয়ার যেখানে যে-কোনো চেতনার পরিচয়, উদ্দেশ্যর পরিচয়, বুদ্ধির পরিচয়, তা সবই ওই নউস্‌-এর দরুন। তাই অব্যক্ত ও অচেতন প্রকৃতির মধ্যে বুদ্ধি, চেতনা, উদ্দেশ্য—সমস্ত কিছুর সঞ্চার হলো এর দরুন। প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠলো। শুধু মূর্ত নয়, নিয়মের রাজত্বও। ডিমোক্রিটাস নিয়তি নামের যে শক্তির কথা বলেছিলেন তা নেহাতই অচেতন, উদ্দেশ্যহীন ও অন্ধ এক শক্তি। ওই অন্ধ শক্তির কথা দিয়ে দুনিয়ার ব্যাখ্যা সত্যিই দেওয়া যায় না। কেননা, দুনিয়া হলো নিয়মের রাজ্য, এখানে সর্বত্রই উদ্দেশ্যর বা বুদ্ধির পরিচয়।

তাহলে, গ্রীক-দর্শনে ইলিয়াটিকদের সঙ্গে হেরাক্লাইটাসের

বিরোধ নিয়ে যে-সমস্যা উঠেছিলো তারই সমাধান খুঁজলেন এই তিনজন দার্শনিক। স্থিতি সত্য, না গতি সত্য? এই নিয়ে সমস্যা। ইলিয়াটিকরা গতিকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। হেরাক্লাইটাস চেয়েছিলেন স্থিতিকে উড়িয়ে দিতে। হেরাক্লাই-টাসের পর তিনজন দার্শনিক তিনভাবে মেলাবার চেষ্টা করলেন স্থিতি আর গতিকে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই তিনজনের কেউই কি স্থিতি আর গতিকে সত্যিই সমান মর্যাদা দিতে পেরেছেন? ভেবে দেখলে দেখবো, তা নয়। কেননা এঁদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আসল ঝোঁকটা থেকে গিয়েছে স্থিতির দিকেই, সনাতনের দিকেই। গতিটা শেষ পর্যন্ত তিনজনের কাছেই নেহাত যেন বাইরের ব্যাপার—এম্‌পিডোক্লিসের প্রেম ও ঘৃণার কথাই বলো, ডিমো-ক্রিটাসের নিয়তির কথাই বলো আর অ্যানাক্সাগোরাসের ওই উদ্দেশ্য বা বুদ্ধির কথাই বলো—এগুলি সবই হলো আদিম পদার্থের বাইরের ব্যাপার। সে-পদার্থের নিজের মধ্যে কোনো গতি নেই, পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন যেটুকু তার উৎস অন্যত্র।

এ যেন এক রকম ঘুটি খেলার ব্যাপার। ঘুটিগুলোকে তুমি হাজারো রকমে সাজাতে পারো, গোছাতে পারো। এক-এক ভাবে গোছানোর দরুন এক-এক রকম দেখতে হবে। কিন্তু ঘুটিগুলো যা তাই থেকে গেলো। বদলালো না। তার মানে বদলটা বাহ্য, বদলটা ফালতু, বদলটা মূল নয়, বদলটা আসল নয়। বদলটাকে তাই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া গেলো না, কিন্তু সত্যের দরবারে তাকে রীতিমতো খাটো একটা আসন দেওয়া হলো।

॥ চেতন-অচেতন সমস্যা : সফিষ্ট সক্রেটিস প্লেটো ॥

অ্যানাক্সাগোরাসের দর্শনে আর একটি নতুন সমস্যা উঠলো : চেতন আর অচেতনের সম্বন্ধ নিয়ে সমস্যা।

চেতন আর অচেতন মানে কী? একতাল মাটির সঙ্গে একটি মানুষের তফাতটা দেখা যাক। মাটির তালটার সাড় নেই, হুঁশ নেই; মাটির তালটা ভাবতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না। মাটির তালটা তাই অচেতন। মানুষের হুঁশ আছে, সাড় আছে, মানুষ ভাবতে পারছে, বুঝতে পারছে চিন্তা করতে পারছে। মানুষের চেতনা আছে।

অ্যানাক্সাগোরাস্ চেতন-অচেতন নিয়ে কোন ধরনের নতুন সমস্যা তুললেন? তাঁর আগে পর্যন্ত গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে কেউই এ-কথা ভাবেন নি যে সৃষ্টির আদিতে ছিলো চেতনা। চেতনা থেকেই জগৎ এসেছে। এ-কথার বদলে তাঁরা মনে করতেন, আদিতে ছিলো শুধু অচেতন পদার্থ। থ্যালিস থেকে ডিমোক্রিটাস পর্যন্ত প্রত্যেকের কথাই ভেবে দেখো। থ্যালিস ভেবেছিলেন, আদিতে ছিলো জল—শুধু জল। জল থেকেই সব-কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। এখন, জলের মধ্যে তো আর চেতন বলে কিছু নেই। জল নেহাতই অচেতন বা জড় বস্তু। তাহলে, শুরুতে চেতনা বলে কিছু নয়। শুরুতে শুধু বস্তু। তেমনি, ডিমোক্রিটাস মনে করলেন, শুরুতে শুধুই পরমাণু আর নিয়তির শক্তি : তার জন্যে চেতনার কোনো স্থান নেই। থ্যালিস থেকে ডিমোক্রিটাস পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকের বেলাতেই এই কথা।

অ্যানাক্সাগোরাসই প্রথম অন্য কথা বললেন। বললেন,

শুরুতে চেতনা, আদিতে চেতনা। চেতনাকে আদি কারণ বলে মানতে হবে। তা যদি না মানো তাহলে শুধুমাত্র অন্ধ ও অচেতন বস্তু থেকে এই ত্বনিয়া কী করে এলো সে-প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না।

অ্যানাক্সাগোরাসের আগে পর্যন্ত গ্রীক-দর্শনে প্রধান সমস্যা হলো স্থিতি আর গতি নিয়ে। অ্যানাক্সাগোরাস তুললেন আর একটি নতুন সমস্যা : চেতনের সঙ্গে অচেতনের সম্পর্ক কী? কোনটা আগে? কোনটা আদিতে? কোনটাকে মৌলিক বলে মানতে হবে? আর তিনি বললেন, চেতনাকে আদি কারণ বলতে হবে। অবশ্য শুরুতে চেতনা ছাড়াও অন্ধ প্রকৃতিও ছিলো। কিন্তু চেতনাই সেই বোবা প্রকৃতির মধ্যে যেন ভাষা ফোটালো, অন্ধ প্রকৃতিকে নিয়মের রাজ্য করে তুললো। এ ধরনের কথা গ্রীক-দর্শনে তাঁর আগে আর কেউই বলেন নি।

তারপর, কিছুদিন ধরে গ্রীক-দার্শনিকদের মুখে শোনা গেলো চেতনার জয়জয়কার। অ্যানাক্সাগোরাসের পর সফিষ্ট-দল, তারপর সক্রেটিস, তারপর প্লেটো—এঁরা সকলেই যেন উঠে-পড়ে লাগলেন চেতনার প্রাধান্যটা প্রমাণ করবার আশায়। কীভাবে, তাই দেখা যাক।

অ্যানাক্সাগোরাস চেতনাকে মৌলিক মনে করলেন। কিন্তু এ-চেতনা ঠিক কার চেতনা? যদি বলো, ভগবানের চেতনা তাহলে না হয় বুঝতে পারা যায়—কুমোর যেমন ভেবেচিন্তে একতাল মাটি থেকে ঘট তৈরি করে ভগবানও তেমনি তাঁর চেতনা খাটিয়ে আদিম ও অন্ধ প্রকৃতি থেকে ত্বনিয়া সৃষ্টি

করেছিলেন। কিন্তু, মুশকিল হলো, চেতনার কথা বললেও অ্যানাক্সাগোরাস এই চেতনাকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করেন নি বা করতে পারেন নি। সরাসরি তিনি তো আর বলতে পারলেন না যে আদিতে চেতনা ছিলো—সে-চেতনা ঈশ্বরের বা ভগবানের। আর-এক রকম কথা হতে পারতো : মানুষের চেতনা। তোমার চেতনা, আমার চেতনা, আমাদের চেতনা। সে-কথাও অ্যানাক্সাগোরাস সোজাসুজি বলতে পারেন নি। আর ঠিক এই কথাটাই বললো তাঁর পরের দার্শনিক-দল, যাঁদের নাম দেওয়া হয় কিনা সফিষ্ট।

সফিষ্টরা ছিলো তর্কে ধুরন্ধর। অমন তর্ক সে-যুগে আর কেউই করতে পারতো না। ওরা নাকি তর্ক করে দিনকে রাত প্রমাণ করে দিতে পারতো। এমনকি, ওদের তর্কের লড়াই দেখবার জন্যে সেকালের বড়োলোকরা রীতিমতো পয়সা-খরচ করতো,—তর্ক করাই ছিলো সফিষ্টদের পেশা।

এ-হেন সফিষ্টরা তর্ক করে প্রমাণ করতে লাগলো যে মানুষের চেতনা বা মানুষের মনই সবচেয়ে চরম সত্য, তার চেয়ে সত্য আর কিছুই হতে পারে না। এই দলের মধ্যে একজন খুব ডাকসাইটে তার্কিক ছিলেন। তাঁর নাম প্রোটাগোরাস্। তিনি বলতেন, মানুষ দিয়েই সবকিছুর আসল মাপ—man is the measure of all things। তার মানে? মানে, কোনটে সত্যি কোনটে সত্যি নয়, কোনটে কতোখানি সত্যি আর কোনটে কতোখানি মিথ্যে—তা বোঝবার একমাত্র মূলসূত্র হলো মানুষের মনমেজাজ। মানুষ যে-কথা

যে-ভাবে ভাবছে সে-কথা শুধু সেইভাবেই সত্যি।

যেমন ধরো, চলতিভাবে বলা হয় নুনটা নোনতা। তার মানে, বাইরের পৃথিবীতে যেন নুন বলে একটা জিনিস রয়েছে, তার মধ্যে নোনতা স্বাদ বলে একটা গুণ রয়েছে। কিন্তু সফিষ্টরা কী বললেন ? ও-কথার কোনো মানে হয় না। তোমার-আমার নোনতা লাগে বলেই নুনকে নোনতা বলা হয়। তার মানে, নুনের পক্ষে ওই যে নোনতা হওয়া তা একান্তভাবেই নির্ভর করছে মানুষের চেতনার ওপর। মানুষের চেতনার কথা বাদ দিলে নুনের পক্ষে নোনতা হওয়ার কোনো মানেই হয় না। দুনিয়ার সবকিছুর বেলাতেই এই রকম। সবকিছুই নির্ভর করছে মানুষের চেতনার ওপর। মানুষের চেতনাটাই তাই পরম সত্য। সত্য বলতে বাকি যা-কিছু তা ওই চেতনার দরুনই সত্য।

চেতনাটাই সব। চেতনাটাই মূল। চেতনাটাই পরম সত্য। জগৎকে যে সত্য মনে করছো তা এই চেতনার ওপর নির্ভর করবার অর্থেই সত্য। মানুষের চেতনার কোনো রকম পরোয়া না করলে কোনো কিছুই ছিটেফোঁটাও সত্য হতে পারে না।

কথায় বলি, অমুখটা ভালো তমুখটা মন্দ। এটা ন্যায় ওটা অন্যায়। এটা সাধু ওটা অসাধু। সফিষ্টরা বললেন, এ সব কথার কোনো মানে হয় না। কেননা, সবার উপরে হলো আমার মন—আমার মন যা চায় তাই ভালো, যা চায় না তাই মন্দ ; আমার যা রোচে তাই ন্যায়, যা রোচে না তাই অন্যায় ; যাতে সুখ পাই তাই হলো সাধু, যাতে সুখ পাই না তাই অসাধু।

তা হয় না,—প্রাচীন গ্রীসের আর-একজন জ্ঞানী বললেন।

তাঁর নাম সক্রেটিস। সক্রেটিস বললেন, কথাগুলো শুধুই যে ভুল তাই নয়,—এ-রকম মারাত্মক কথাবার্তার মোহে পড়লে মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই হাটবাজার থেকে শুরু করে বড়োলোকদের খানাপিনার আসর পর্যন্ত নানান জায়গায় তিনি ওই সফিষ্টদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতেন। সফিষ্টরা তো ছিলো ধুরন্ধর তার্কিক—তর্ক করাই তাদের পেশা। কিন্তু সক্রেটিসের সঙ্গে তর্কে পেরে ওঠা তাদেরও সাধ্য নয়।

সক্রেটিসের পক্ষে তর্ক করবার ঢংটা ছিলো দারুণ মজার। যেন নিজে কিছুই জানেন না বোঝেন না—তোমাকে দুটো কথা শুধিয়ে তোমার কাজ থেকেই কিছু জেনে নিতে চান। কিন্তু যেই তুমি কিছু একটা বললে অমনি তিনি প্রশ্ন করতে শুরু করবেন —তোমার কথার এখানটা বুঝছি না, ভালো করে বুঝিয়ে দাও; তোমার কথার ওখানটা বুঝছি না, ভালো করে বুঝিয়ে দাও। যতোই তুমি জবাব দিতে যাবে ততোই নতুন নতুন প্রশ্নের মুখে পড়বে আর এইভাবে হিমসিম খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত তুমি অবাক হয়ে দেখবে, শুরুতে তুমি নিজে যে-কথা বলেছিলে শেষ পর্যন্ত আবার তুমিই তার উলটো কথা বলতে বাধ্য হচ্ছো। তার মানে? মানে, যেটাকে তুমি ভেবেছিলে জ্ঞান সেটা আসলে জ্ঞান নয়, জ্ঞানের অভাব—অজ্ঞান।

এইভাবেই, সফিষ্টদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে তিনি প্রমাণ করে দিতেন সফিষ্টদের অতো যে দম্ভ তা জ্ঞানের দরুন নয়, অজ্ঞানের দরুনই।

কিন্তু সক্রেটিস কি শুধু ওইটুকুই প্রমাণ করতে চাইতেন যে

কেউ কিছুই জানে না, মানুষের পক্ষে জ্ঞান সম্ভবই নয়?

না। কেননা, সক্রেটিস মনে করতেন যা সাধু, যা ন্যায়, যা উচিত তা শুধু তোমার-আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার ওপর নির্ভর করে না। তা সকলের পক্ষেই সাধু, সকলের পক্ষেই ন্যায়, সকলের পক্ষেই ভালো। তা চিরন্তন, তা সার্বভৌম, তার নিজস্ব সত্তা আছে। কিন্তু কথা হলো, কী করে তার রূপটি আবিষ্কার করবো? সক্রেটিস বললেন, এরও একটা উপায় আছে। কী রকম উপায়? সাধুতার কয়েকটা নমুনা নাও: এটা, ওটা, সেটা, আরো কয়েকটা। পেত্যেকটাই সাধুতার দৃষ্টান্ত। তাই প্রত্যেকটির মধ্যেই সাধুতার রূপটিকে খুঁজে পাবার কথা। কিন্তু কী করে খুঁজবো? এই যে, এটা ওটা সেটা বা আরো পাঁচটা নমুনা, এগুলোর মধ্যে কোনো কোনো দিক থেকে নিশ্চয়ই মিল আছে—মিল না থাকলে পাঁচটাকেই সাধুতার নমুনা বলছি কী করে? আবার, এগুলোর মধ্যে নিশ্চয়ই তফাতও আছে—কোনো তফাতই যদি না থাকতো তাহলে এটার সঙ্গে ওটাকে আলাদাই করতে পারতাম না। তার মানে, মিলের দিকও আছে, তফাতের দিকও আছে। প্রশ্ন হলো, তফাতের দিক-গুলোকে তল্লাস করলে কি সাধুতার প্রকৃত রূপটিকে খুঁজে পাবো? তা কেমন করে হবে? কেননা, সাধুতা রয়েছে প্রত্যেকটির মধ্যে, আর তফাতের দিক মানেই হলো একটার মধ্যে আছে, আর একটার মধ্যে নেই। তাহলে? তাহলে নিশ্চয়ই সাধুতার খোঁজ করতে হবে অন্য দিকটায়—মিলের দিকটায়। অর্থাৎ কি না, ভেবে দেখতে হবে ঠিক কী কারণে, কিসের জন্যে, একেও বলছি সাধুতার

নমুনা, ওকেও বলছি সাধুতার নমুনা, তাকেও বলছি সাধুতারই নমুনা। সেই কারণটিকেই খুঁজে পেলেই বুঝতে পারা যাবে সাধুতা মানে আসলে কী। বুঝতে পারা যাবে, চিরকাল ধরে, সাধুতার প্রতিটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই, ঠিক কিসের বিকাশ রয়েছে। সেইটেই হবে চিরন্তন সাধুতার রূপ!

সক্রেটিস ভাবলেন, এইভাবেই সাধুতার স্বরূপটিকে খুঁজে বের করা সম্ভব।

সক্রেটিসের যিনি সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য তাঁর নাম প্লেটো। প্লেটো বললেন, গুরুদেবের ওই পদ্ধতিটিকে আরো একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানে? সক্রেটিস তাঁর ওই পদ্ধতির সাহায্যে প্রধানতই সাধুতার স্বরূপটি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন! প্লেটো ভাবলেন, তা কেন? মোটের উপর ওইভাবেই তো গোরু-ভেড়া-বাড়ি-ঘর—এক কথায় ত্বনিয়ার সবকিছুরই স্বরূপ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাবে।

কিন্তু সে আবার কোন ধরনের কথা? গোরু ভেড়া বাড়ি ঘর—এসবের আবার স্বরূপ মানে কী?

আগে, প্লেটোর সমস্যাটা ভালো করে দেখা যাক।

গোরু নিয়ে সমস্যা কী রকম? ধরো, আমি এক হাজারটা গোরু দেখেছি: এক নম্বর গোরু, ত্ব নম্বর গোরু, তিন নম্বর গোরু—এইভাবে হাজার নম্বর পর্যন্ত। এখন, ওই এক নম্বর গোরুটা তো আর ত্ব নম্বর গোরু নয়—ত্বটো আলাদা। ত্বটোর মধ্যে তফাত রয়েছে। কিন্তু তবুও ত্বটোকেই আমি গোরু বলছি। তার মানেই হলো, ওই এক আর ত্ব নম্বর—ত্বটো গোরুর মধ্যে

এমন কিছু নিশ্চয়ই সমানভাবে বা একইভাবে বর্তমান রয়েছে যার দরুন আমি দুটোকেই এক নামে ডাকতে পারছি, দুটোকেই গোরু বলতে পারছি। এ-কথা শুধু দুটো গোরুর বেলাতেই তো আর সত্যি নয়, পৃথিবীতে যতো কোটি কোটি গোরু আছে সবের বেলাতেই সত্যি। প্রত্যেকটাই প্রত্যেকটা থেকে আলাদা, আবার প্রত্যেকটার সঙ্গেই প্রত্যেকটার মিল রয়েছে—তা না হলে প্রত্যেকটাকেই গোরু বলি কেমন করে ?

কিন্তু কথা হলো, ওই যে দুটো দিক—তফাতের দিক আর মিলের দিক—ওর মধ্যে ঠিক কোন দিকটিকে তল্লাস করলে আমরা গোরুর আসল রূপটাকে খুঁজে পাবো ? কোন দিকটার মধ্যে গোরুর গোরুত্ব ? নিশ্চয়ই তফাতের দিকটায় নয় ; কেননা তফাতের দিক একটার মধ্যে আছে আর একটার মধ্যে নেই। তাই গোরুর আসল খবর যদি পেতে চাই তাহলে জানতে হবে, বুঝতে হবে, ঠিক কোন কারণের দরুন সব গোরুকেই আমি গোরু বলে ডাকছি—গোরুর ওই গোরুত্ব মানে কী ?

এখন এই যে গোরুত্ব—একে কি কখনো চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায় ? তা কী করে যাবে ? আমি এ-গোরুকে দেখতে পারি, ও-গোরুকে ছুঁতে পারি—কিন্তু সবই তো হলো নির্দিষ্ট এক-একটা গোরু। গোরুত্ব কোথায় ?

তার মানে, ওই গোরুত্বকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না,—এক কথায় ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে জানবার কোনো উপায় নেই। ওই গোরুত্বের নাগাল পাওয়া যায় বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে। তার মানে, গোরুত্বটা মূর্ত পৃথিবীর জিনিসই

নয়, ধ্যানরাজ্যের জিনিস। অর্থাৎ কিনা ধারণা।

প্লেটো বললেন, গোরুর ওই যে ধারণা ওইটেই হলো একমাত্র সত্য। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে-সব কোটি কোটি গোরু দেখছি সেগুলো ওই ধারণাটিরই ছায়া। আর ছায়া বলেই সেগুলো মিথ্যে, মায়া। সেগুলোকে সত্যি ভেবে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টাটা মতিভ্রম ছাড়া আর কী?

শুধু গোরুর বেলাতেই তো আর প্লেটোর এই বক্তব্য নয়। ছনিয়ায় আমরা যা-কিছু দেখছি, জানছি, শুনছি,—সবকিছুর বেলাতেই তাঁর ওই একই কথা। আর যদি তাই হয় তাহলে মোটের ওপর তাঁর মতটা কী হলো? তাঁর মতে এই পুরো ছনিয়াটাই মিথ্যা বা মায়া হয়ে গেলো। আর সত্য বলতে? সে এক ধ্যানরাজ্য, ধারণার রাজ্য। সে-রাজ্যে নানা রকম ধারণা হয়েছে—কিন্তু সেইগুলি শুধু ধারণামাত্র। সেই-রাজ্যের এক একটি ধারণার কোটি কোটি ছায়া পড়ছে—আমরা বোকার মতো ওই ছায়াগুলোকেই সত্যি মনে করছি। ভাবছি বাড়িটা সত্যি, গোরুটা সত্যি, জমিটা সত্যি, লাঙলটা সত্যি।

প্লেটোর এ-সব কথাবার্তার পেছনে কতখানি পিথাগোর-পন্থীদের প্রভাব, কতোখানি ইলিয়াটিকদের প্রভাব তাই নিয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করেছেন। কিন্তু কথা হলো, সত্যের সন্ধানে এগুতে এগুতে মানুষ শেষ পর্যন্ত এ-কোন সংকটের অবস্থায় এসে পড়লো? এ-মতকে মানতে গেলে যে তোমাকে-আমাকে কাউকেই সত্যি বলে মানা যাবে না! বলতে হবে, কোনো এক ধ্যানরাজ্যে মানুষ বলে কোনো একটা ধারণা আছে,—আমরা

সবাই তার ছায়া-মাত্র !

॥ অ্যারিষ্টটল্ ॥

কিন্তু আরো কথা আছে। গ্রীক চিন্তাধারা যে শেষ পর্যন্ত কী রকম সংকটে পড়লো তার পরিচয় পাবার জন্যে প্লেটোর শিষ্য অ্যারিষ্টটল্-এর কথাটাও বুঝতে হবে। যদিও কিনা, প্লেটোর শিষ্য হলেও অ্যারিষ্টটলের মনে গুরুভক্তির ছিটেফোঁটাও ছিলো না।

অ্যারিষ্টটল্ অনেক বিষয়ে অনেক বইপত্তর লিখেছিলেন। আমাদের পক্ষে তো আর সবকিছুর আলোচনা করবার উপায় নেই। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মতটুকুই আলোচনা করা সম্ভব হবে।

ন্যায়শাস্ত্র মানে ? কীভাবে চিন্তা করা উচিত, কিংবা, কী ভাবে চিন্তা করলে ভুলের ভয় থাকবে না,—এই হলো ন্যায়শাস্ত্রর সমস্যা। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যেই সমস্যাটা উঠেছিলো, অ্যারিষ্টটল্-এর বহুদিন আগে থাকতেই। জেনো আর হেরাক্লাইটাসের কথা মনে আছে তো ? জেনো বলেছিলেন, গতি বা পরিবর্তনকে সত্যি বলে মানা যায় না। কেননা, তা মানতে গেলে দুটো উলটো কথাকে একই সঙ্গে স্বীকার করবার দরকার পড়ে—একই জিনিস সম্বন্ধে বলতে হয় 'আছে' আর 'নেই', দুইই। হেরাক্লাইটাস বলেছিলেন, তা নয়। একসঙ্গে দুটো বিরুদ্ধ কথা বলতে ভয়টা কী ? কেননা ওই বিরোধই যে সত্য ! জন্ম আর মৃত্যু, মৃত্যু আর জন্ম—দুয়ের দ্বন্দ্ব প্রতিটি বস্তুর মধ্যে, প্রতি মুহূর্তে।

তাই ধারণায় ধারণায় বিরোধ বাধবার ভয়ে গতিকে উড়িয়ে দিতে যাবো না। তার বদলে বলবো, গতিই সত্য এবং যা সত্য তাকে বুঝতে হলে বিরোধকে, সংঘাতকে,—বাদ দিয়ে ভাববার চেষ্টাই চলবে না।

তাহলে, ভাববার পদ্ধতিটা কী রকম হবে? এ-নিয়ে দেখা গেলো, জেনোর এক রকম মত, হেরাক্লাইটাসের আর-এক রকম মত। জেনোর পদ্ধতিটাকেই যদি খাঁটি বলে স্বীকার করি তাহলে আর গতি বা পরিবর্তনকে কোনো মতেই সত্য বলা যাবে না। আর হেরাক্লাইটাসের পদ্ধতিটাকে যদি খাঁটি বলে স্বীকার করি তাহলে বলতে হবে গতিই সত্যি।

এ ক্ষেত্রে, অ্যারিষ্টট্‌ল্‌-এর চেষ্টাটা কী রকম হলো? চেষ্টা হলো, হেরাক্লাইটাসের পদ্ধতিটাকে চিরকালের মতো নস্যাৎ করে দেওয়া, কিংবা, যা একই কথা, জেনোর চেষ্টাটাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অ্যারিষ্টটল্‌ কী বললেন? বললেন যদি নির্ভুলভাবে চিন্তা করতে চাও তাহলে একই মুখে এক সঙ্গে 'হাঁ' আর 'না' দুকথা বলা চলবে না। দুটি বিরুদ্ধ ধারণার ঠাঁই একসঙ্গে হতেই পারে না। যদি হাঁ বলতে চাও তাহলে শুধুমাত্র হাঁ-ই বলতে হবে; যদি না বলতে চাও তাহলে শুধুমাত্র না-ই বলতে হবে—হাঁও নয় নাও নয়, এমন কথা বলা চলবে না; হাঁও বটে নাও বটে, এমন কথাও বলা চলবে না। অ্যারিষ্টটল্‌ বললেন, এই হলো গিয়ে ন্যায়শাস্ত্রের মূল কথা। অর্থাৎ কিনা, নির্ভুলভাবে চিন্তা করতে চাইলে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে একই সঙ্গে, একত্রে; দুটি উলটো ধারণা টেঁকতে পারে না।

মনে রেখো, এ-কথা জোর করে বলবার ফলাফলটা কী তা ইতিপূর্বেই অর্থাৎ জেনোর বেলাতেই—স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। কেননা ঠিক এই কথাটির উপর নির্ভর করেই জেনো প্রমাণ করে দিতে চাইলেন, পুরো ছুনিয়াকে মায়া বা মিথ্যা মনে করতেই হবে। কেন? কেননা, গতির কথা বাদ দিয়ে তো আর ছুনিয়াকে চেনবার চেষ্টাই চলে না। অথচ, গতিকে বা পরিবর্তনকে সত্যি বলে মানতে হলে স্বীকার করতেই হবে যে ছুটো বিরুদ্ধ কথা—আছে আর নেই, হঁা আর না, জন্ম আর মৃত্যু, ছুরকমের কথা—একই সঙ্গে একই বিষয় সম্বন্ধে সত্যি হতে পারে।

অনেকেই বলেন, প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের ঢের ঢের তফাত। প্লেটোর চোখ ছিলো ধ্যানরাজ্যের দিকে, কল্পনার জগতে। আর অ্যারিষ্টটলের চোখ ছিলো মাটির দিকে, প্রকৃতিকে ভালো করে চেনা-জানার দিকে। প্লেটো ছিলেন কবি, অ্যারিষ্ট-টল্ বৈজ্ঞানিক। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু গুরুশিষ্যের মধ্যে এই রকমের তফাত খুঁজতে যাওয়াটা সত্যিই যে কতোখানি সঙ্গত সে-বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। কেননা, মূলত ছুজনের চেষ্টাটাই এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়; অভিজ্ঞতায় পাওয়া এই মূর্ত পৃথিবীটা মায়া, মিথ্যা, অসত্য। অবশ্যই, অ্যারিষ্টটল্ অনেক বিজ্ঞানের বই লিখেছিলেন এবং কয়েক শো বছর ধরে একটানা ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত পণ্ডিতই এই বইগুলিকে বেদবাক্যের সমান মনে করতেন। কিন্তু সেটা অ্যারিষ্টটলের গৌরবের কথা না সে-যুগের ইয়োরোপের পণ্ডিতদের চরম লজ্জার কথা তা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার। কেননা, বিজ্ঞানের যেটা মূল কথা—

অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই তথ্যকেই বিচার বিশ্লেষণ করে জ্ঞান পাবার চেষ্টা—অ্যারিষ্টটল্ একেবারে তার ধারই ধারেন নি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কী রকম ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো তার একটা নমুনা দিই। তিনি একটা বইতে লিখে গিয়েছেন যে মেয়েদের মুখের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় কম দাঁত থাকে। এখন অ্যারিষ্টটলের নিজের দু-দুজন বৌ ছিলেন ; এঁদের মধ্যে একজন কাউকে যদি একটি-বারের তরে হাঁ করিয়ে তিনি স্বচক্ষে দেখতেন সত্যি কটা দাঁত, তাহলে আর ওরকম হাস্যকর কথা তাঁকে লিখতে হতো না। কিন্তু দেখবেন কি—চোখের দেখায়, অভিজ্ঞতায়, বিশ্বাস থাকলে তো! কিন্তু এর চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, তিনি মারা যাবার পর হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সারা ইয়োরোপ জুড়ে পণ্ডিত হিসেবে যাঁদের নামডাক সবচেয়ে বেশি তাঁরা নিজেরাই এমনকি এই সব আজগুবি কথাকেও বেদবাক্যের মতো সত্যি মনে করেছেন! ওই যুগটাকে তাই অন্ধকারের যুগ ছাড়া আর কী বলা যায়?

অন্ধকারের যুগটার কথা পরে তুলবো।

॥ কয়েকটি সমস্যা ॥

গ্রীক যুগের জ্ঞানীদের কথা আমরা আর আলোচনা করবো না। তার প্রধান কারণ, জায়গার টানাটানি—এখনো ঢের কথা বাকি আছে। আর দ্বিতীয় কারণ, থ্যালিস্ থেকে অ্যারিষ্টটল্ পর্যন্ত যেটুকু ইতিহাস আলোচনা করা হলো তার মধ্যেই দর্শনের

সবচেয়ে জরুরী সমস্যাগুলি উঠেছে। বরং, ওই সমস্যাগুলিকেই ভালো করে দেখে নেওয়া যাক।

প্রথম প্রশ্ন হলো, জগৎটা সত্যি না মায়া? একজন বলছেন মায়া, আর একজন বলছেন সত্যি,—যদিও অবশ্য এতো সব অজস্র বস্তুর মধ্যে কোনটা মূল সত্যি তা ভালো করে চেনবার চেষ্টা করা দরকার।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, চৈতন্য বড়ো, না বাস্তব প্রকৃতিটাই বড়ো? কোনটা আগে? কোনটা বেশি সত্য? একদল বলছেন, ওই বাস্তব প্রকৃতিটাই আসলে বড়ো, কোনো রকম চিন্তা বা ধারণার ওপর তা নির্ভর করে না। যেমন ধরো, থ্যালিস্, ডিমোক্রিটাস বা আরো অনেকের মত। আর একদল বলছেন, তা নয়। আসলে মনই বড়ো, চেতনাই বড়ো, ধারণাই বড়ো। আমরা যাকে বস্তুজগৎ মনে করছি তা আসলে ওই চেতনার ওপরেই নির্ভর করে, বা তা ঐ ধারণাগুলিরই ছায়ামাত্র। যেমন ধরো, সফিষ্টদের আর প্লেটোর কথা।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, গতিকে কি সত্য বলা যায়? না, যা সত্য তা চিরন্তন বা সনাতন? গতির ধারণাটা শুধু দেখার ভুল, মনের ভ্রম? একদল বললেন, গতি মিথ্যা—যেমন ধরো, জেনো, পারমানাইডিস্, প্লেটো। আবার হেরাক্লাইটাস বললেন, তা নয়। গতিই সত্য।

চতুর্থ প্রশ্ন হলো, চিন্তার পদ্ধতি নিয়ে। নির্ভুলভাবে চিন্তা করবার জন্যে আমরা কি বিরুদ্ধ ধারণাকে বর্জন করতে বাধ্য? হেরাক্লাইটাস বলেছিলেন, তাও কি কখনো হয়? ওই বিরোধটাই

যে সবকিছু—প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই একদিকে জন্ম আর একদিকে মৃত্যু। অ্যারিষ্টটল্ বললেন কখনোই তা হতে পারে না। বিরোধকে মানা মানেই ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া।

এই চারটে সমস্যার কথা খুব ভালো করে মনে রাখতে বলছি। কেননা, এই চারটেই হলো দর্শনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বড়ো সমস্যা।

॥ দাস-সমাজ আর দর্শনে সংকট ॥

এখন অন্য একটা প্রশ্ন তুলি।

মনে আছে তো, গ্রীস উপনিবেশেই বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিলো? মিশরে হলো না, ব্যাবিলোনিয়ায় হলো না—তার তুলনায় মিলেটাস বলে কোন এক অর্বাচীন শহরেই কিনা বিজ্ঞান জন্মাতে পারলো! এমন কেন? কেননা, আমরা দেখেছি মিশরে বা ব্যাবিলোনে সমাজের যে-রকম গড়ন তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের জন্যে কোনো জায়গা থাকে না; যদি অনেকখানি এলাকা জুড়ে পুরোহিতরাজের কোনো একচ্ছত্র রাজত্ব গড়ে ওঠে তাহলে সে রাজ্য টেঁকিয়ে রাখবার জন্যে পাইক-পেয়াদার মতোই কুসংস্কার দরকার; আর কুসংস্কার দরকার বলেই বিজ্ঞানের আলোয় পৃথিবীকে চেনবার চেষ্টা নিষিদ্ধ।

গ্রীক সভ্যতার আওতায় কিন্তু তা নয়। এখানে সমাজের যারা মাথা তারা পুরোহিত-রাজ নয়, সওদাগর। শহরগুলো সওদাগরির ঘাটি—সেখানে নানান দেশের নানান মানুষ জড়ো হয়। তাই নানা রকম কুসংস্কার যেন পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খেতে

খেতে এটা ওটাকে নাকোচ করে দেয়। তাছাড়া, সওদাগরি করতে গেলে তো আর ঘরের কোণে জুজুবুড়ির ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকলে চলে না। রীতিমতো সাগর পাড়ি দিতে হয়,—পেরিয়ে যেতে হয় দূর দেশ, দূর পাহাড়। আর এই সব নানান কারণের দরুন তাদের মন থেকে মুছে যেতে শুরু করলো কুসংস্কার, বিজ্ঞানের জন্ম হলো গ্রীক সভ্যতার আওতায়।

কিন্তু এই গ্রীক সভ্যতাতেই কী এমন সংকট ঘনিয়ে এলো যার দরুন কিনা দেশের জ্ঞানীগুণীরা একেবারে চরম অবাস্তব কল্পনায় বিভোর হয়ে উঠলেন? প্লেটো আর অ্যারিষ্টটলের কথাই ভেবে দেখা যাক। প্লেটো বললেন, এই দুনিয়ার পিছনে রয়েছে এক ধ্যানরাজ্য—সেইটেই চরম সত্য, এই দুনিয়াটা তারই ছায়ামাত্র। অ্যারিষ্টটল এমন এক যুক্তিশাস্ত্রের বনিয়াদ গাঁথলেন যার দরুন গতি বা পরিবর্তনকে আর কোনোমতেই সত্যি বলবার উপায় রইলো না। এমন কি, বিজ্ঞানের বই নাম দিয়েও তিনি এমন সব আজগুবি কথাবার্তা লিখতে দ্বিধা করলেন না যেগুলিকে কিনা সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আজগুবি বলে চিনতে অসুবিধে হয় না। তবুও, অভিজ্ঞতার অতোটুকুও সাহায্য তিনি নেন নি। তার কারণ, অভিজ্ঞতার উপরই তাঁর আর একটুও আস্থা ছিলো না।

এক কথায় অবস্থাটা কী রকম হয় দাঁড়ালো? জ্ঞানীদের মন থেকে মুছে গেলো বাস্তব পৃথিবী সম্বন্ধে সবটুকু বিশ্বাস, গতি বা পরিবর্তনের উপর সবটুকু বিশ্বাস, অভিজ্ঞতার উপর সবটুকু বিশ্বাস। ফলে, জ্ঞানের কথা হিসেবে তাঁরা যা বললেন তা

একান্তই তাঁদের মনগড়া কথা, কল্পনামাত্র!

সত্যের সন্ধানে এগিয়ে মানুষ শেষ পর্যন্ত এ-রকম সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়লো কেন? জবাবটা খুঁজে পাওয়া যাবে গ্রীক সমাজের গড়নটির মধ্যেই।

গ্রীক সমাজ ছিলো দাস-সমাজ। কিন্তু দাসসমাজেরও একটা ইতিহাস আছে। শুরুর দিকে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হলো প্রধানত ঘরকন্নার কাজেকর্মে। কিন্তু যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই দেখা গেলো, স্বাধীন গ্রীকরা গতর খাটাবার সমস্ত রকম দায়িত্বই ওই ক্রীতদাসদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। তারা নিজেরা এমনকি কুটোটি পর্যন্ত ভাঙতে নারাজ।

এবার ভেবে দেখো, ওই গ্রীক সমাজে ক্রীতদাসদের মর্যাদা বলতে ঠিক কতোটুকু? একটুও নয়। যে-মানুষগুলোকে গোরু-ভেড়ার মতো হাটে-বাটে কেনাকাটা করা যায় তাদের আবার মর্যাদা কী? ক্রীতদাসেরা নেহাতই গোরু-বলদের মতো, হাল-লাঙলের মতো,—কেবল কথা কইতে পারে, এই যা তফাত। ঠিক এই কথাই বললেন অ্যারিষ্টটল্। বললেন, ক্রীতদাসেরা শুধুমাত্র কথা কইতে পারে এমন হাতিয়ারেরই মতো। গ্রীক সমাজে ক্রীতদাসদের মর্যাদা শেষ পর্যন্ত কতোটুকু তা অ্যারিষ্ট-টলের ওই কথাটি থেকেই আন্দাজ করা যায়।

তাহলে, মোটের ওপর অবস্থাটা কী হলো? কাজকর্মের বা গতর খাটাবার সব রকম দায়িত্বই ক্রীতদাসদের ওপর আর ওই ক্রীতদাসরা যেন পুরো মানুষ নয়—কিংবা, অতি অধম আর হীন ধরনের মানুষ! আর যদি তাই হয় তাহলে গ্রীকদের কাছে শ্রম

বা গতর খাটাবার মর্যাদা শেষ পর্যন্ত কতোটুকু হয়ে দাঁড়াবার কথা? একটুও নয়। শ্রম হলো নেহাতই ছোটোলোকের লক্ষণ, ইতরের লক্ষণ, ক্রীতদাসদের লক্ষণ।

ফলে, গ্রীক সমাজে যারা জ্ঞানী, যারা গুণী, যারা বিদ্বান, যারা মহৎ—তাদের ধারণাতেও শ্রমের মর্যাদা বলতে কিছুই রইলো না। সত্যের সন্ধানে তাঁরা অগ্রসর হতে চাইলেন শুধুমাত্র চিন্তার সাহায্যে, শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে,—তাঁরা ভাবলেন, শুধুমাত্র চিন্তা করে, বুদ্ধির মারপ্যাঁচের সাহায্যে চরম সত্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

এই অবস্থায়, বাস্তব দুনিয়ার কথা, বাস্তবকে বদল করবার কথা, গতি বা পরিবর্তনের কথা, অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকৃতির নিয়মকানুনকে আবিষ্কার করবার কথা—কোনো রকম কথাই কি তাঁদের মনে স্থান পেতে পারে? কী করে পারে? এই সব প্রতিটি কথার পিছনেই যে মানুষের শ্রম রয়েছে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে কোনো রকমের যোগাযোগই হবে না, অভিজ্ঞতা হবে না। পৃথিবীটাকে বদল করবার দায়িত্ব যাদের উপর শুধুমাত্র তাদের পক্ষেই স্পষ্টভাবে অনুভব করা সম্ভব এই বদল বা পরিবর্তনটি কতোখানি বাস্তব।

এক কথায়, গ্রীক সভ্যতায় চিন্তাশীলদের সঙ্গে কাজকর্মের বা শ্রমের সম্পর্কটা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবার দরুনই চিন্তাশীলদের কাছে বাস্তব পৃথিবী, পরিবর্তন, অভিজ্ঞতা—সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে যেতে লাগলো। ফলে, সত্যের সন্ধানে দেখা দিলো দারুণ সংকট। মনগড়া কল্পনাকেই জ্ঞানীরা পরম সত্য মনে করতে

লাগলেন। স্বচক্ষে দেখা পরিবর্তন বা গতি একেবারে মিথ্যা হয়ে যেতে লাগলো।

গ্রীক দর্শনের আলোচনা করে এই যে-কথাটি শেখা গেলো এর মূল্য খুবই বেশি। কেননা, অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও দেখা যায়, যতোই কিনা শ্রমের সঙ্গে চিন্তার, কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে ততোই চিন্তাশীলদের মন থেকে বাস্তব প্রকৃতির কথা মুছে গিয়েছে, একটা মনগড়া কল্পনাকেই তাঁরা চরম সত্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। সব দেশের দর্শন নিয়ে আলোচনা করবার জায়গা হবে না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের দর্শন সম্বন্ধে কিছু কথা তোলা যাক।

॥ ভারতীয় দর্শনের কথা ॥

কিন্তু আমাদের দেশের দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার নানা রকম মুশকিল আছে। আলোচনা শুরু করবার আগে সে-সম্বন্ধে কিছুটা কথা না বললেই নয়।

বহুদিন ধরে আমাদের দেশ ইংরেজদের শাসনে থেকেছে। ইংরেজরা আমাদের বোঝাতে চেয়েছে যে আমরা—ভারতবাসীরা—নেহাতই খাটো ধরনের মানুষ: সভ্যতায়, শিক্ষায়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, কোনোদিক থেকেই ওদের সমান নই। তাই আমাদের পক্ষে দাসত্বটাই স্বাভাবিক।

বলাই বাহুল্য, কথাগুলো মিথ্যে। আমাদের ঠকাবার জন্যেই ওরা এ-রকম কথা আমাদের মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করেছে। ফলে, আমাদের দেশেও যখন স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হলো তখন

আমাদের পণ্ডিতরাও আমাদের দেশের অতীত গৌরবটাকে খুব বড়ো করে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস খুঁড়ে প্রমাণ দেখাতে লাগলেন কতো মহান, কতো উচ্চ আমাদের সভ্যতা।

সে-কথায় নিশ্চয়ই কোনো ভুল নেই। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবের কি তুলনা হয়? আর তারই বাহক আমরা—আজকের ভারতবর্ষীয়রা। তাই আমাদের খাটো ধরনের বা নিচু ধরনের মানুষ বলে প্রতিপন্ন করবার ওই সাহেবী চেষ্টাটা সত্যিই নেহাত ধাপ্পা দেবার চেষ্টাই।

কিন্তু এই সঙ্গেই আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। আমাদের জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতদের চেষ্টার মধ্যে অনেক সময়েই একটা ভুল ঝোঁক দেখা দিয়েছিলো! এই ভুল ঝোঁকটা ঠিক কী রকম? কেন এ-রকম ভুল ঝোঁক দেখা দিলো?

আমাদের দেশের কোনো কোনো পণ্ডিত প্রমাণ করতে চাইলেন, আমাদের দেশের অতীত গৌরবটা হলো শুধুমাত্র অধ্যাত্মবাদের গৌরব। অনেকেই বলতে শুরু করলেন পশ্চিমের ওরা হলো জড়বাদী,—এই ধুলোর পৃথিবীটাকেই একমাত্র সত্য মনে করছে আর তাই কতকগুলো তুচ্ছ সুখভোগকেই চরম মূল্য দিয়ে বসেছে। তার বদলে, আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন, সংসারটা অনিত্য, মায়া, মিথ্যা। এই সংসারের কতকগুলো স্থূল সুখকেই পুরুষার্থ মনে করাটা নেহাতই স্থূলবুদ্ধির লক্ষণ। তাই তাঁরা অমৃতের পুত্র মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যা থেকে অমৃত বা অমরত্ব পাওয়া যাবে না তাই

নিয়ে লাভ কি? তাঁরা বলেছিলেন, অল্পে সুখ নেই, ভূমাই সুখ। তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলো। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের দেশের নানান বিদ্বানের মুখে নানাভাবে ও বারবার এই কথাগুলো শুনতে শুনতে আমাদের অনেকেরই ধারণা হয়েছে সত্যিই বুঝি তাই! সত্যিই বুঝি অনাবিল অধ্যাত্মবাদই আমাদের দেশের আদি ও অকৃত্রিম দর্শন।

অথচ, কথাগুলো ভুল। কেন ভুল সে-কথা একটু পরেই আলোচনা করা যাবে। তার আগে বোঝা দরকার, দেশের খুব বড়ো বড়ো পণ্ডিতও কেন এ-রকম ভুল ধারণাকেই সত্যি বলে মনে করছেন।

তার একটা বড়ো কারণ হলো, আমাদের তুলনায় আমাদের শাসকদের, অর্থাৎ ইংরেজদের, মধ্যে সত্যিই বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঢের বেশি হয়েছিলো। প্রকৃতিকে জেনে প্রকৃতিকে জয় করবার কলাকৌশল ইংরেজেরা সত্যিই আমাদের চেয়ে ঢের বেশি আয়ত্ত করেছিলো। তাই আমাদের দেশের গৌরব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টায় আমাদের বিদ্বানেরা আর পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উন্নতির গর্ব নিয়ে পাল্লা দেবার চেষ্টা করলেন না। তার বদলে, ওই বিজ্ঞানের আদর্শটাকেই—অর্থাৎ কিনা, পৃথিবীকে জয় করবার আদর্শটাকেই—ছোটো বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন। এটা ভুল। কেননা, এর দরুন দেশের মানুষের সামনে একটা ভুল আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ বলে দাঁড় করাবার ঝোঁক এসে গিয়েছে। দেশের মানুষকে যদি সত্যিই উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে

যেতে হয় তাহলে বরং তাদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসটাই বেশি করে, ভালো করে জাগাবার চেষ্টা করা দরকার। আমরাও পৃথিবীকে চিনে পৃথিবীকে জয় করতে পারি, পারবো। এবং এই দিক থেকে আমাদের বুদ্ধি অন্য কোনো দেশের মানুষের চেয়ে কম নয়—দেশের মানুষকে এই কথাটি বলতে পারার মধ্যেই সত্যিকারের স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় হবে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের বিকাশের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে যে-সব বাধাবিঘ্ন রয়েছে সেগুলির কথাও দেশের মানুষকে ভালো করে বোঝানো দরকার—যাতে আমরা সবাই মিলে সেই বাধাবিঘ্নগুলিকে দূর করতে পারি। এই সব বাধাবিঘ্নের মধ্যে প্রধান হলো মান্ধাতার আমলের পুরোনো নানা রকম কুসংস্কার। যেমন ধরো, তুমি যতোক্ষণ মনে মনে বিশ্বাস করছো যে বসন্ত রোগের আসল কারণ হলো শীতলা দেবীর রাগ ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার পক্ষে বসন্ত রোগের বীজাণু আবিষ্কার করবার, এবং সেই বীজাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করবার, কোনো রকম চেষ্টাই সম্ভবপর নয়।

সুখের বিষয়, যাঁরা দেশকে ভালো বেসেছিলেন এবং সেই-সঙ্গেই যাঁরা অধ্যাত্মবাদের মোহে পড়েন নি—আমাদের দেশের এ-হেন বিদ্বানেরা সত্যিই অন্যদের মতো বিজ্ঞানকে ছোটো করতে চান নি, বিজ্ঞানের জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে চান নি অধ্যাত্মবাদী চিন্তার গৌরব।

এখানে মাত্র দু জনের নাম উল্লেখ করবো : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর আর প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

একবার কথা উঠেছিলো, কলেজের ছেলেদের পাঠ্যতালিকা

থেকে পাশ্চাত্যের আধুনিক বৈজ্ঞানিক তর্কবিদ্যা (ইনডাক্‌টিভ্‌ লজিক) বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দেশের পুরনো কালের বেদান্ত, সাংখ্য ইত্যাদি পড়ানো হবে। বিদ্যাসাগর মশাই এই সুপারিশের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখনকার লাটসাহেবকে তিনি খোলা চিঠি লিখেছিলেন এবং তাতে বলেছিলেন আমাদের দেশের বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন ছাত্রদের মনকে পরলোকপরায়ণ করে তুলবে—তাতে সত্যিই দেশের মঙ্গল হবে না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'হিন্দু কেমিষ্ট্রি' বলে খুব নামকরা বই আছে। সেই বইতে তিনি লিখেছেন, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের যে তেমন ভালো বিকাশ হতে পারলো না তার নানা কারণ আছে। প্রথমত জাতিভেদ। এই জাতিভেদের দরুন সব রকম হাতের কাজকে ছোটো ধরনের বা নিচু ধরনের কাজ বলে দেখবার চেষ্টা হয়েছিলো, তাই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্যে যে পরীক্ষা প্রভৃতির প্রয়োজন সেদিকে দেশের মানুষের মন যেতে পারে নি। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব। এই দর্শন অনুসারে পৃথিবীটা মায়া, মিথ্যা। আর বিদ্বানদের মনে যদি সত্যিই এ-রকমের বিশ্বাস হয় তাহলে পৃথিবীকে চিনে পৃথিবীকে জয় করবার উৎসাহ আসবে কোথা থেকে?

এতো কথা তুললাম এইজন্যে যে দেশপ্রেমের খাতিরে দেশের মানুষের সামনে একটা ভুল আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ বলে প্রচার করায় দেশকে সত্যিকারের ভালোবাসবার পরিচয় নেই। অধ্যাত্মবাদটাই সবচেয়ে বড়ো আদর্শ—এমন কথা মনে করা নিশ্চয়ই ভুল।

তার বদলে বরং স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা দরকার, এই অধ্যাত্মবাদের প্রতি মোহই আমাদের দেশের উন্নতিপথে কতোখানি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। বিঘ্ন যে সৃষ্টি করেছিলো তা তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা থেকেই বুঝতে পারা গেলো।

শুধু তাই নয়। ইতিহাসের দিক থেকেও এ-কথা বলা খুবই ভুল হবে যে আমাদের দেশে কেবলমাত্র অধ্যাত্মবাদের বিকাশ ঘটেছে। অধ্যাত্মবাদ নিশ্চয়ই ছিলো, কিন্তু সে-মতবাদের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষের মনের কথা—দেশের বেশির ভাগ মানুষের মনের কথা নয়।

একথা শুনলে প্রথমটায় হয়তো খুবই অবাক লাগবে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায়, কথাটা কতোখানি সত্যি।

গ্রীক দর্শনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে-সব কথা জানতে পারা গিয়েছে সেগুলিকে মনে রাখলে ভারতীয় দর্শনের কথাটাও বোঝবার সুবিধে হতে পারে। গ্রীসের বেলায় দেখা গেলো, চিন্তাশীলেরা যতোই শ্রমকে, হাতের কাজকে, ঘৃণার চোখে দেখতে শিখেছেন ততোই এই পরিবর্তনশীল বাস্তব পৃথিবীটা তাঁদের চোখের আড়ালে পড়তে শুরু করেছে। আমাদের দেশের বেলাতেও মোটের উপর সেই রকমই নাকি ?

॥ বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ॥

আমাদের দেশে চূড়ান্ত অধ্যাত্মবাদী দর্শনটির নাম বেদান্ত। এ-

নামের মানে আছে। বেদের অন্ত, বেদান্ত। বেদ হলো খুবই পুরনো কালের রচনা, যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার অন্তত হাজার দেড়েক-ছয়েক বছর আগেকার তো হবেই। এখন, বেদ নামের ওই গ্রন্থগুলি একদিনের রচনা নয় : বহু শতাব্দী ধরে বহু মানুষ এগুলির বিভিন্ন অংশ রচনা করেছিলেন। পরে সেগুলিকে একত্রিত করে এক-একটি বেদ, বা সংহিতা, তৈরি হলো। তাই একই বেদের কোনো অংশ অপর কোনো অংশের তুলনায় বহু পুরনো—হয়তো এমনকি হাজার বছরের পুরনোও।

এই বেদ বা সংহিতার পর আরো এক রকম গ্রন্থ রচিত হয়। সেগুলিকে বলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে প্রধানতই যাগযজ্ঞের নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা। এগুলি অনেক পরের যুগের রচনা হলেও শেষ পর্যন্ত সংহিতার সঙ্গে এগুলিকে জুড়ে দেওয়া হয়। তখন থেকেই বলা হচ্ছে বেদের দুই অংশ : এক—সংহিতা বা মন্ত্রের সংকলন, দুই—ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের পর আরো দু রকম সাহিত্য রচিত হলো : আরণ্যক আর উপনিষদ। অনেক পরের যুগের হলেও এগুলিকেও বেদের শেষ ভাগে জুড়ে দেওয়া হলো। এইভাবেই, বেদের একেবারে শেষ প্রান্তে উপনিষদ। তাই উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত।

কিন্তু উপনিষদ তো আর একটি নয়, অনেক। নানান উপনিষদে নানান কথা আলোচনা করা হয়েছে, এক কথার সঙ্গে আর-এক কথার মিল খুঁজে পাওয়াই কঠিন। অথচ, পরের যুগের বিদ্বানেরা বলতে লাগলেন যে মিল আছে। আলাদা আলাদা উপনিষদে আলাদা আলাদা কথা লেখা নেই—আসলে

একই সার তত্ত্ব বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে।

সেই সার তত্ত্বটি ঠিক কী? তা বোঝাবার জন্যেই বাদরায়ণ বলে একজন জ্ঞানী একটি পুঁথি রচনা করলেন। তার নাম ব্রহ্মসূত্র। স্বভাবতই ব্রহ্মসূত্রকে আবার বেদান্তসূত্রও বলা হয়।

আরো অনেক পরের যুগে আমাদের দেশের বিভিন্ন দার্শনিক এই ব্রহ্মসূত্রের উপরই ভাষ্য রচনা করেন, ব্রহ্মসূত্রে ছোট্ট ছোট্ট করে যে-সব কথা লেখা আছে সেই কথাগুলিকেই তাঁরা ওই সব ভাষ্যের মধ্যে ফলাও করে বোঝাচ্ছেন বলে দাবি করলেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, একজন ভাষ্যকারের সঙ্গে অপর একজন ভাষ্য-কারের মতের মিল নেই। ফলে, বেদান্ত দর্শন বলতে শেষ পর্যন্ত আর কোনো একটি মতবাদ বোঝালো না। নানান দলের নানান মতাবলম্বী দার্শনিকেরা প্রত্যেকেই নিজেদের বৈদান্তিক বলতে লাগলেন। এই সব দার্শনিকদের মধ্যে একজনের নাম হলো শঙ্করাচার্য। বেদান্তর নামে তিনি যে-মতবাদটি প্রচার করেছেন তাকে বলে অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবেদান্ত। এই মতবাদ অনুসারে : ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম হুবহু এক।

অবশ্যই, শঙ্করাচার্য ছাড়াও আরো নানা দার্শনিক উপনিষদ বা বেদান্তর নামে নিজেদের মতবাদ পেশ করেছেন,—প্রত্যেকেরই দাবি, তাঁরা যা বলছেন তা তাঁদের নিজেদের কথা নয়, উপনিষদের কথাই। তাই, উপনিষদগুলিতে শঙ্করাচার্যের মতবাদ ছাড়া আর কোনো রকম মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না—এমন কথা নিশ্চয়ই খুব জোর গলায় বলবার জো নেই। কিন্তু আপাতত আমরা সে-তর্কে যেতে চাই না। আমরা শুধু এইটুকুই দাবি

করছি যে শঙ্করাচার্য যে মতবাদটি প্রচার করেছেন উপনিষদের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা— এই চূড়ান্ত ভাববাদ উপনিষদের মধ্যে নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছিলো। তাহলে, ভারতীয় দর্শনে ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সংহিতা থেকে উপনিষদগুলির কথা পর্যন্ত আলোচনা করা ভালো।

আগেই বলেছি, যদিও পরের যুগে উপনিষদগুলিকে বেদের শেষভাগ বা বেদান্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে তবুও বেদের—অর্থাৎ সংহিতার—রচনাকাল এবং উপনিষদের রচনাকাল—দুয়ের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান থেকে গিয়েছে। এখন এই যে কয়েক শতাব্দীর সময়, এর মধ্যে মানুষের জীবনে এবং মানুষের চিন্তা-ধারায় যে একেবারে কোনো পরিবর্তনই হয়নি,—এমন কথা নিশ্চয়ই ভাবা যায় না।

পরিবর্তনটা কী রকম? প্রথমে জীবনযাপনের পরিবর্তনটা দেখা যাক। তারপর চিন্তাধারার পরিবর্তনটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

যারা ওই সংহিতা বা বেদ রচনা করেছিলো তারা কারা? তারা ছিলো, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষী মানুষদের একটি দল। তার মানে? মানে হলো, আজকালকার পণ্ডিতেরা সাব্যস্ত করেছেন বহুকাল আগে ক্যাস্‌পিয়ান্‌ সমুদ্রের কিনারায় একজাতের মানুষের বাস ছিলো। যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই এরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এক-একটি দল পৃথিবীর এক-এক দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কোনো দল যায়

গ্রীসের দিকে, কোনো দল ইরানের দিকে, কোনো দল ভারতবর্ষের দিকে। এই সব বিভিন্ন দলের মানুষদের ভাষায় অনেক মিল আছে। ফলে, এইজাতীয় প্রত্যেক ভাষাকেই বলা হয় ইন্দো-ইউরোপীয় জাতের ভাষা।

যারা সংহিতা বা বেদ রচনা করেছিলো, তারা ছিলো এই রকমেরই একদল মানুষ। ভারতবর্ষে পৌঁছোবার আগেই তারা বেদ রচনা করেছিলো, না, তারপর বেদ রচনা করেছিলো—এ-বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনো সুনিশ্চিত নন। কিন্তু এই বেদগুলি পড়লেই আন্দাজ করা যায় যে যখন তারা বেদ রচনা করেছিলো তখন তারা কী রকম জীবন-যাপন করতো।

আধুনিক পণ্ডিতেরা বলছেন, তাদের রচনা ওই সংহিতাগুলির মধ্যেই প্রমাণ থেকে গিয়েছে যে তারা প্রধানত পশুপালন করেই জীবনযাপন করতো, যদিও অবশ্য তা ছাড়াও তারা কিছুকিছু চাষবাসের কাজ শিখেছিলো।

এখন, মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে-সব কথা জানা গিয়েছে তার উপর নির্ভর করেই বোঝা যায়, এই পশুপালন আর চাষবাসই তার জীবনে যুগান্তর এনেছিলো। তার মানে অবশ্যই পশুপালন আর চাষবাসের কথা একসঙ্গে নয়: পৃথিবীর কোথাও পশুপালনের দরুনই মানুষের জীবনে আকাশ-পাতাল তফাত দেখা দিয়েছে, আবার কোথাও বা সে-তফাত দেখা দিয়েছে চাষবাস শিখতে পারবার দরুন। কেননা, পশুপালন বা চাষবাস ভালো করে শিখতে পারবার দরুনই মানুষ আগেকার তুলনায় পৃথিবীর কাছ থেকে অনেক বেশি জিনিস আদায় করতে

শিখলো। এর আগে পর্যন্ত দলের সবাই মিলে পরিশ্রম করে পৃথিবীর কাছ থেকে মাত্র ততোটুকু জিনিসই পায় যার সাহায্যে দলের সবাই কোনোমতে টায়েটুয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তাই দলের মধ্যে সবাই মিলে সমানে-সমান হয়ে বাঁচতে বাধ্য। সে-অবস্থার নাম হলো আদিম সাম্য-সমাজ। কিন্তু পশুপালন বা চাষবাস শিখতে পারবার ফলে মানুষের উৎপাদনশক্তি অনেক বেড়ে গেলো—নিছক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যেটুকু জিনিস নইলে নয় তার চেয়েও বেশি জিনিস মানুষ তৈরি করতে পারলো। ফলে, এই সময় থেকেই দেখা গেলো কয়েকজনের পক্ষে গতর না খাটিয়েও অন্যদের খাটুনির বাড়তি ফলটুকু আত্মসাৎ করে বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা। তাই মানুষের সমাজ ক্রমশই স্পষ্ট দুভাগে ভাগ হয়ে যেতে লাগলো : একদিকে শ্রমিক আর একদিকে শোষক। শেষ হলো আদিম সাম্যসমাজ, শুরু হলো শ্রেণীসমাজ।

অবশ্যই এ-তফাত রাতারাতি ঘটে নি। অনেক বছর সময় লেগেছিলো—কয়েক শো বছর নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের আলোচনার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী কথাটা হলো, পশুপালনের উন্নতি মানুষকে আদিম সাম্যসমাজ থেকে শ্রেণীসমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পশুপালনের যুগটা তাই মানুষের ইতিহাসে যেন এক সীমারেখার নির্দেশ দেয় : তার একদিকে আদিম সাম্যসমাজ, তার অপরদিকে নতুন শ্রেণীসমাজ।

আর, সংহিতাগুলির মধ্যে যদি ওই পশুপালনেরই পরিচয় থাকে তাহলে মানতে হবে এ-সাহিত্য যুগসন্ধির সাহিত্য।

অবশ্যই, সংহিতাগুলি একদিনে রচিত হয় নি, হাজার বছর ধরে রচিত হয়েছিলো। তাই এগুলির মধ্যে নানা রকম সমাজজীবনের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। নানা রকম মানে? একদিকে দেখা যায় এগুলি আদিম সাম্যসমাজের স্মৃতিতে ভরপুর, আর একদিকে দেখা যায় এগুলির মধ্যে নতুন শ্রেণীসমাজের ছবিটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দুটো বিষয়েরই কিছুকিছু নমুনা দেখা যাক।

সংহিতাগুলির মধ্যে আদিম সাম্যসমাজের স্মৃতি যে কতো স্পষ্ট তা নানান দিক থেকে অনুমান করা সম্ভব। যেমন ধরো, সংহিতাগুলির নানা শাখা-উপশাখার নাম পাওয়া যায়; এই সব নামের মানে যখনই বুঝতে পারা সম্ভব তখনই দেখা যায়, পশুপাখি বা গাছগাছড়ার নাম থেকেই তাদের উৎপত্তি: সাপ, ব্যাঙ, তিতির পাখি, বরাহ, পিপুল গাছ ইত্যাদি। এ-ভাবে নামকরণ করবার মূলে যে টোটেম্-বিশ্বাস রয়েছে তা আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। টোটেম্-বিশ্বাস আদিম সাম্যসমাজেরই লক্ষণ। তাই এই নামগুলিই মনে পড়িয়ে দেয় যে বৈদিক মানুষদের আদিম সাম্যজীবন খুব বেশি দিনের পুরনো কথা নয়।

কিংবা ধরো, বৈদিক সমাজে সভা আর সমিতির স্থান। আজো পৃথিবীর নানা জায়গায় যে-সব মানুষ আদিম সাম্যসমাজে পড়ে রয়েছে তাদের দেখলেও বোঝা যায় ওই সমাজের কাজ চালাবার জন্যে সভা আর সমিতির স্থান কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ।

সংহিতায় যতো কবিতা তার মূলে কোনো না কোনো কামনা: গোরু, অন্ন, সোমরস, সন্তান—এই রকম কয়েকটি

জিনিসের কামনা। কিন্তু, যেটা বিশেষ করে লক্ষ্য করা দরকার, "আমাকে দাও" বা "আমার এটা হোক বা ওটা হোক"— এমনতরো কথা সংহিতার মধ্যে খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে। তার বদলে প্রায় সর্বত্রই কামনাটি রূপ পাচ্ছে আ মা দে র এটা হোক বা আ মা দে র ওটা হোক—এক কথায়, যা-কিছু চাওয়া তা পুরো দলের জন্যে, নিজের জন্যে বা একার জন্যে নয়।

এই রকম আরো অনেক নমুনা রয়েছে– সবই সাম্যজীবনের স্মৃতির নমুনা।

কথা হলো, সংহিতা-সাহিত্যে কি অধ্যাত্মবাদের পরিচয় পাওয়া যায়? এ-প্রশ্ন নিয়ে বড়ো মুশকিল আছে। কেননা, পরের যুগে সংহিতার কতকগুলি কথার মানে একেবারে বদলে গিয়েছে; তাই শুরুতে কথাগুলির কী মানে ছিলো তা আমরা প্রায় ভুলে গিয়েছি। উদাহরণ হিসেবে দুটো শব্দ দেখা যাক: দেবতা আর যজ্ঞ। পরের যুগে এ-দুটো কথাই অধ্যাত্মবাদ-মূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেবতাকে পুজো করা হচ্ছে, কিংবা যজ্ঞ করা হচ্ছে পরলোকে কিছু পাবার আশায়। কিন্তু সংহিতাগুলি ভালো করে পড়লে বোঝা যায় সেখানে দেবতা কথাটির সঙ্গে পুজোপাঠের কোনো সম্পর্ক নেই: মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, পূষণ, সকলেই বরং যেন দলের নেতা, দলের সখা। আর যজ্ঞ বলতে আজকাল যেরকম পরলোকে কিছু পাবার আশায় ক্রিয়াকর্ম বুঝিয়েছে সংহিতার অন্তত পুরনো অংশগুলিতে তা নিশ্চয়ই নয়; তার বদলে খুব সম্ভব আদিম সাম্যসমাজে সবাই

মিলে একসঙ্গে উৎপাদনের চেষ্টাই।

আদিম সাম্যসমাজে মানুষে-মানুষে সম্পর্কটা সহজ-সমান সম্পর্ক বলেই অন্যায় অবিচার ইত্যাদির কথা মানুষের চেতনাতেই যেন ফুটে ওঠে নি। আমরা বলি, সত্যি কথা কওয়া ভালো, মিথ্যে কথা কওয়া অন্যায় ; অপরকে সাহায্য করা উচিত, সাহায্য না-করা অনুচিত—ওই ধরনের আরো অজস্র কথা। কিন্তু যতোদিন পর্যন্ত মানুষের জীবনে একের স্বার্থ আর দশের স্বার্থ আলাদা হয় নি ততোদিন পর্যন্ত তার মাথায় এ-রকমের ন্যায়-অন্যায় বা উচিত-অনুচিতের তফাত দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই। তার বদলে মানুষের ধারণায় সর্বত্রই এক অমোঘ নিয়মের প্রভাব। তা ছাড়া, এ-অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেন একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক। তাই মানুষের জীবন যে-অমোঘ নিয়মের সূত্রে বাঁধা সেই নিয়মের দরুনই পুব দিকে সূর্য উঠছে, কালো গোরু থেকে সাদা দুধ পাওয়া যাচ্ছে, আরো কতো কী!

ঋগ্বেদে এই অমোঘ নিয়মটির নাম দেওয়া হয়েছে ঋত। ঋত বলতে যে ঠিক কী বোঝায় তা আজকের দিনে আমাদের পক্ষে ব্যাখ্যা করতে পারা প্রায় অসম্ভব। তার কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সমান-সহজ সম্পর্ক থেকে এই চেতনার জন্ম, তার স্মৃতি আমাদের মন থেকে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু, আগেই বলেছি, পশুপালনের উন্নতি হতে হতেই মানুষের সেই আদিম সাম্যসমাজ ভেঙে গেলো। এই ভাঙনের সূত্রপাত সংহিতাগুলির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বা দেখা যায় সংহিতার কবিরা বলছেন, পরের অন্নের উপর নির্ভর

করবার লাঞ্ছনা থেকে যেন আমরা ও আমাদের জ্ঞাতিরা মুক্তি পাই। কোথাও বা দেখা যায় তাঁরা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করছেন, আমরা যেন এক হতে পারি। স্পষ্টই বোঝা যায় এগুলি হলো সাম্যসমাজের ভাঙন ধরবার ছবি।

কিন্তু ওই ভাঙনের চেহারা আরো প্রকট হলো সংহিতার পরের সাহিত্যে। সে-সাহিত্যের নাম ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, যজ্ঞ দেবতাদের কাছ থেকে 'আমি তোমাদের অন্ন হবো না'—এই বলে চলে গিয়েছিলেন। একবার নয়, বারবার এই কথা। তার থেকেই বোঝা যায় সমাজে কতো বড়ো পরিবর্তন ঘটছে : অতীত কালে অন্ন-র উপায় ছিলো যজ্ঞ, যজ্ঞ বলতে খাদ্য-উৎপাদনের যৌথ প্রচেষ্টা। সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, যজ্ঞ বিদায় নিচ্ছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই বলা হচ্ছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যজ্ঞর অনুসরণ করলো এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণই যজ্ঞকে ধরে আনলো। তার মানে, পরের যুগে ব্রাহ্মণেরা যে-ক্রিয়াকাণ্ডকে যজ্ঞ বললো তা আদি-অকৃত্রিম যজ্ঞ নয়। আদি-অকৃত্রিম যজ্ঞ বিলুপ্ত হয়েছিলো, এটা তার বদলে অন্যকিছু। এই পরিবর্তনের পাশাপাশিই দেখা যায় বৈদিক দেবতাদের চরিত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটছে। একজন দেবতার কথা ধরো। নাম বরুণ। সংহিতায় দেখা যায় এ-দেবতা মানুষের কতো বড়ো সহায়—মানুষকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, বুদ্ধি দিচ্ছে, ধনসম্পদ দিচ্ছে। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই যখন তার পুনরাবির্ভাব হলো তখন দেখি তার চরিত্রে লোভ ছাড়া আর কিছুই যেন নেই। আর সে কী বীভৎস লোভ, পড়তে পড়তে যেন গা ছমছম করে! রাজা

হরিশ্চন্দ্রের ছেলে হয় না, রাজা বরুণের কাছে মানত করলেন ছেলে হলে বরুণকে সেই ছেলে দেবেন। রোহিত বলে হরিশ্চন্দ্রের ছেলে হলো। বরুণ বললেন, ছেলে দেবে বলেছিলে, দাও। রাজা বললেন, দশ দিন না হলে পশু মেধ্য হয় না-- দশটা দিন যাক। দশ দিন পরে বরুণ বললেন, ছেলে দেবে বলেছিলে—দাও। রাজা বললেন, ওর দাঁত উঠুক, তখন দেবো। রোহিতের দাঁত উঠলো। বরুণ এসে বললেন, এবার দাও। রাজা বললেন, ছেলের দুধে দাঁত পড়ুক, তখন দেবো। দুধে দাঁত পড়তেই বরুণ আবার উপস্থিত : ছেলে দেবে বলেছিলে— ছেলে দাও। রাজা বললেন, ওর দাঁত উঠুক তখন দেবো। এইভাবে একের পর এক অজুহাত দেখাতে দেখাতে রাজা কিছুটা সময় নেন, আর প্রতিবারই বরুণ হানা দেন কলকাতার কাবুলীওয়ালাদের মতো, পাওনা আদায়ের তাগিদে।

সমাজ ভেঙে যাচ্ছে। মানুষের মনে জাগছে অন্ধ লোভ। তারই প্রতিবিম্ব ওই দেবতার মধ্যে—দেবতার লোভের মধ্যে।

আদিম সাম্যসমাজ ভেঙে একদিকে যে রকম রাজা দেখা দিচ্ছে অপরদিকে তেমনিই দেখা দিচ্ছে দীনদরিদ্র মানুষ। এ-হেন একজনের নাম অজীগর্ত, স্ত্রী আর তিন ছেলে নিয়ে সে-বেচারা উপোস দিয়ে দিন কাটায়। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক শো গোরু দিয়ে তার কাছ থেকে তার মেজো ছেলেটিকে কিনে নিলেন, এবং এই কেনা ছেলেটিকে দিয়েই বরুণের ঋণ শোধ করতে চাইলেন।

সাম্যসমাজ ভেঙে গিয়েছে, নগদ দাম দিয়ে মানুষ কেনা-বেচা

শুরু হয়েছে।

ঋতর কী হলো? সাম্যজীবনের সেই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ন্যায়-বোধটি? বলছি, শোনো।

অজীগর্তের ওই মেজো ছেলেটির নাম শুনঃশেপ। বরুণের কাছে বলি দেবার জন্যে তাকে যখন যূপকাষ্ঠে বাঁধা হলো তখন অতীতের স্মৃতিটা উদ্বুদ্ধ করবার আশায় তিনি কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতায় তিনি বলছেন:

"আমাদের কৃত পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করো,
নির্ঋতিকে পরাঙ্মুখ করে দূরে রাখো।"

আগেকার সমানে-সমান সম্পর্ক চুরমার হয়ে গিয়েছে, ঋতর স্থান দখল করতে এসেছে নির্ঋতি! নির্ঋতি মানে ঋতর ঠিক উলটো। অতীতের সেই ন্যায়বোধটির স্মৃতি জাগাতে চাইছেন শুনঃশেপ, মুক্তি চাইছেন নির্ঋতির হাত থেকে। এই হলো ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের কথা।

ব্রাহ্মণের পর উপনিষদ। উপনিষদেই দেখা যায় ভাববাদী চিন্তার বিকাশটা স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওই ভাববাদে কি সমস্ত মানুষেরই মনের কথা নাকি? মোটেই নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি গল্পে খুবই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যারা রাজা, উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের মধ্যে শুধুমাত্র তাদেরই মনের কথা। গল্পটির নাম, শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ। ছোট্ট করে গল্পটা বলে নিই, কেননা ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ঠিক কোন শ্রেণীর মানুষের সম্পর্ক তা এর চেয়ে স্পষ্টভাবে আর কোথাও লেখা নেই।

শ্বেতকেতু গিয়েছিলেন রাজসভায়। সেখানে প্রবাহণ নামে রাজার এক মোসায়েব তাঁকে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। শ্বেতকেতু তার একটিরও জবাব জানতেন না। তাই রাজসভা থেকে ফিরে এসে তাঁর বাবাকে বললেন—ওই সব বিষয়ে আমাকে উপদেশ দাও নি কেন? বাবা বললেন, কী করবো? আমি নিজেই যে এ-সম্বন্ধে কিছু জানি না। এই বলে শ্বেতকেতুর বাবা নিজেই চললেন রাজসভায়। রাজাকে বললেন, ওই অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিন। রাজা তাঁকে বলেছিলেন, এতোদিন পর্যন্ত ক্ষত্রিয় ছাড়া আর কেউই এই বিদ্যা জানতো না; আর তাই জন্যেই সব জায়গায় ক্ষত্রিয়দেরই অতোখানি শাসনক্ষমতা: "তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূৎ"।

তাহলে, উপনিষদের ওই ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদ ঠিক কোন শ্রেণীর মানুষদের দর্শন! উপনিষদেই লেখা আছে—যারা শাসক, যারা রাজা, এ-দর্শন কেবলমাত্র তাদেরই জানা ছিলো। শুধু তাই নয়। তা ছাড়াও উপনিষদে আরো একটা খুব জরুরী কথা লেখা রয়েছে। লেখা রয়েছে, এই অধ্যাত্মবাদী দর্শনের জোরেই শাসকশ্রেণীর এতোখানি শাসন-ক্ষমতা। অধ্যাত্মবাদই যে শাসকশ্রেণীর পক্ষে শাসন-কাজের এক হাতিয়ার সে-কথা বোধ হয় আর কোথাও এতো স্পষ্টভাবে লেখা নেই।

এই হলো ভারতীয় দর্শনে অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব-কাহিনী! সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ,—আদিম সাম্যসমাজ ভেঙে দেখা দিলো শ্রেণীসমাজ আর সেই শ্রেণীসমাজে শুধুমাত্র শাসক-শ্রেণীরই

মনের কথা হিসেবে অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী দর্শন।

লোকায়ত মানে কি ?

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ? তাদের মনের কথাটা ঠিক কী রকম ছিলো? তারা কোন ধরনের দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস করেছে?

আমাদের দেশে এ-বিষয়ে সাধারণ মানুষদের ধ্যানধারণার নাম হলো লোকায়ত। লোকেষু আয়তো, লোকায়তঃ। সাধারণ লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এ-ধরনের মতবাদকে বলা হয় লোকায়ত। কিন্তু ওই লোকায়ত নামটারই আরো মানে হয়। সেই মানে অনুসারে, যারা শুধুমাত্র ইহলোককেই সত্য মনে করে তাদেরই বলে লোকায়ত বা লোকায়তিক। এ-হেন লোকায়ত-দর্শনের উপর এককালে যে পুঁথিপত্র লেখা হয়েছিলো সে-বিষয়ে নানান প্রমাণ রয়েছে; কিন্তু ওই পুঁথিপত্রগুলি আর নেই। পুঁথিপত্রগুলির কী হলো? অনেকেই সন্দেহ করেন যে সেকালের শাসকেরা পুঁথিপত্রগুলিকে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সাফ করে দিয়েছিলো। কেবল লোকায়ত দর্শনের কয়েকটা টুকেরো-টাকরা চিহ্ন পড়ে রয়েছে—তাও আবার বিপক্ষের লেখার মধ্যে : লোকায়তিকদের বিদ্রূপ করবার জন্যেই বিপক্ষেরা এ-ধরনের কিছু কিছু কথার উল্লেখ করেছেন। এই কথাগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায় যে লোকায়তিকেরা আত্মা মানতো না, ঈশ্বর মানতো না, স্বর্গ নয়, নরক নয়। তারা বলতো, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বা প্রত্যক্ষভাবে যেটুকু জানা যায় সেটুকু ছাড়া আর কোনো কথাই সত্যি বলে মানা চলবে না। মানতে গেলে বিপদের ভয় আছে। কিসের

বিপদ? বিপদটা হলো, পরবঞ্চনপ্রবণ ধর্মছদ্মধূর্তের দল অনুমান, শাস্ত্র বা ওই রকম আরো কয়েকটি প্রমাণের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ধর্মান্ধতা সৃষ্টি করে আর তারই সাহায্যে সাধারণ মানুষকে নানানভাবে ঠকাতে চায়। মণিভদ্র বলে সেকালের একজন লেখক লোকায়তিকদের সম্বন্ধে এই কথাটি বলেছেন।

দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে আমাদের দেশে তেমন ভালো করে গবেষণা করা হয় নি। তার কারণ, আগেই বলেছি, আমাদের দেশের অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতও মনে করছেন যে অধ্যাত্মবাদটাই আমাদের দেশের আসল গৌরব। এমনকি অনেকেই বলেছেন, ভারতবর্ষে বুঝি অধ্যাত্মবাদ ছাড়া আর কোনো রকম দার্শনিক মতবাদের স্থান ছিলো না। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো ভুল ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। কেননা, লোকায়তিক মত ছাড়াও আমাদের দেশে বস্তুবাদী চিন্তার আরো পরিচয় নিশ্চয়ই ছিলো। যেমন ধরো একটি মতের নাম সাংখ্য। শুরুতে এই মতবাদ ছিলো ঘোরতর নাস্তিক আর বস্তুবাদী মতবাদ; পরের যুগে অবশ্য এর সঙ্গে ঈশ্বরের কথা জুড়ে দিয়ে একে খানিকটা আস্তিক সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তা ছাড়া বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যেও দুটি দল—সে-দুটির নাম হলো সৌত্রান্তিক আর বৈভাষিক—বাইরের পৃথিবীটাকে সত্য বলে প্রচার করেছে।

কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকদের বেলায় যেটা আরো বড়ো কথা সেটা হলো গতি বা পরিবর্তনকে সত্যের মর্যাদা দেবার চেষ্টা। এ-চেষ্টা

ভারতবর্ষের আর কোনো দার্শনিকদের মধ্যে এমনভাবে প্রকাশ পায় নি। বৌদ্ধদের প্রধান কথা ছিলো সর্বং ক্ষণিকং—সবকিছুই ক্ষণিক, জন্মাচ্ছে আর মরছে, স্থির বলে কিছু নেই। মনে রাখতে হবে, পরের যুগের বৈদান্তিকেরা শুধুই যে বাস্তব জগৎটাকে মনের ভ্রম বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তাই নয়, গতি বা পরিবর্তনকেও মায়া বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

ভারতীয় দর্শনের সব কথা নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে হবে না। তারপর বদলে, দর্শনের ইতিহাসে যেটা কিনা মূল সমস্যা শুধু তাই নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

মূল সমস্যাটা কী রকম? ভাববাদ-বনাম-বস্তুবাদ সম্বন্ধে সমস্যা। ভারতীয় দর্শনের দলিলপত্রগুলি দেখলে বোঝা যায়, ভাববাদের সঙ্গে ছিলো শাসক শ্রেণীর সম্পর্ক। অপরপক্ষে, দেশের যেটা কিনা দেশের সাধারণ মানুষের দর্শন সেটা বস্তুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারই নাম লোকায়ত।

সাধারণ মানুষের দর্শন কেন বস্তুবাদই হয়ে রইলো? শাসক শ্রেণীর দর্শন কেন অধ্যাত্মবাদ হয়ে দাঁড়ালো? এই প্রশ্ন দুটির পরিষ্কার জবাব পাওয়া যায় ভারতবর্ষের দলিলপত্র থেকে।

লোকায়তিকেরা খেটে খাওয়ায় বিশ্বাস করতো—আর, মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তাদের অমন সম্পর্ক ছিলো বলেই তারা এই পৃথিবীকে মিথ্যা বা মায়া মনে করেনি। প্রমাণ? লোকায়ত মত অনুসারে বার্তাই হলো একমাত্র বিদ্যা। বার্তা মানে? মানে প্রধানতই চাষবাস।

সাধারণ মানুষের ধ্যানধারণার নাম লোকায়ত। সাধারণ মানুষ কারা? যারা কাজ করে, যারা চাষ করে, তারাই।

ওরা কাজ করে। ওরা মাটি কামড়ে পড়ে ছিলো। ওদের চেতনা থেকে তাই আর মাটির পৃথিবীটার কথা মুছে যায় নি।

মনে রাখতে হবে, লোকায়তিকেরা যে-রকম বার্তা বা চাষ-বাসকেই প্রধানতম বিদ্যা বলে প্রচার করেছে তেমনি আবার দিনের পর দিন শাসক শ্রেণীর কাছে ওই কাজ করা,—ওই চাষ করা,—হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘৃণার ব্যাপার, ছোটোলোকের লক্ষণ। যেমন ধরো মনু প্রভৃতি দেশের আইনকর্তারা বারবার বলেছেন, উঁচু জাতের মানুষের পক্ষে চাষ করা উচিত নয়, চাষ করলে জাত যায়, চাষবাসের সঙ্গে বেদজ্ঞান খাপ খায় না।

তাই মোটের উপর প্রাচীন গ্রীসে যে-রকম আমাদের দেশের সেকালেও সেই রকমই: একদল মানুষ যতোই শ্রমকে ঘৃণা করতে শিখেছে ততোই তাদের মন থেকে মুছে গিয়েছে বাইরের জগৎটার কথা,—তারা মনে করছে মনই সব, চেতনাই পরম সত্য। তারই নাম ভাববাদ। বরং ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আরো বেশি স্পষ্ট। কেননা, আমাদের দেশে বৈদান্তিকেরা অনেক সরাসরি তর্ক তুলেছেন, জ্ঞান বড়ো না কর্ম বড়ো এই সমস্যা নিয়ে। আর যিনি হলেন সবচেয়ে বড়ো ভাববাদী দার্শনিক—অর্থাৎ শঙ্করাচার্য—তিনিই সবচেয়ে জোর করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে জ্ঞান ঢের বড়ো, কর্ম ঢের ছোটো। শুধু তাই তাই নয়। তাঁর মতে যতোক্ষণ না তুমি সব রকম কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করছো ততোক্ষন পর্যন্ত তোমার

কিছুতেই দার্শনিক জ্ঞান হবে না!

॥ মধ্যযুগের কথা ॥

তাহলে প্রাচীন যুগেই অধ্যাত্মবাদের আবির্ভাব হলো,—কেন হলো তার আলোচনা কিছুটা করা হয়েছে।

সত্যের সন্ধানে মানুষের অভিযানে এর পরের যুগটাকে সাধারণত বলা হয় অন্ধকারের যুগ। ইতিহাসের ভাষায় তার নাম মধ্যযুগ। মধ্যযুগকে অন্ধকারের যুগ বলা হয় কেন? কেননা, সে-যুগের মূল কথা হলো: মানতে হবে। 'জানতে হবে' নয়, 'মানতে হবে'। কী মানতে হবে? শাস্ত্রের বচন। ধর্মের পুঁথিতে যা লেখা রয়েছে তার চেয়ে বেশি সত্যি আর কিছুই হতে পারে না। তাই চোখে দেখে, বা মাথা খাটিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টাটা মূর্খতা। সত্যকে যদি আবিষ্কার করতে চাও তাহলে শাস্ত্রগুলিকেই ভালো করে বোঝো। শাস্ত্রর উপর টীকা লেখো, টিপ্পনী লেখো। কিন্তু নিজের বুদ্ধিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে সত্যকে খুঁজতে বেরিও না। সে-চেষ্টা শুধু মূর্খতাই নয়, পাষণ্ডের লক্ষণও। কেননা, শাস্ত্রে যা লেখা আছে তা ভগবানের নিজের কথাই। তাই শাস্ত্রকে অস্বীকার করা মানেই হলো ভগবানের নিজের কথা অস্বীকার করা। যে-লোক এ-রকমের কোনো চেষ্টা করছে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

মধ্যযুগে প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই এই রকমের অবস্থা—আমাদের দেশেও, বিদেশেও। তাই, সত্যের সন্ধানে এ-যুগটায় খুব বড়ো কোনো কীর্তি সম্ভবপর হয় নি। তার বদলে, আগেকার

কালের পুঁথিপত্রর উপর রাশিরাশি টীকাভাষ্য রচিত হয়েছে, হয়েছে চুলচেরা বিচার। সে-সব বিচারের মধ্যে নানা রকম বুদ্ধির কসরত থাকতে পারে, তা ছিলোও নিশ্চয়ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোটের উপর সবকিছুই প্রকাণ্ড ব্যর্থতাই। কেননা, যে-কাঠামোর মধ্যে এই প্রচেষ্টা তার পুরোটাই হলো অহেতুক, অসার্থক, বৃথা। একটা কথাকে কতোভাবে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে তার কতো রকমের মানে করা যায় তা দেখতে দেখতে আমরা হয়তো স্তম্ভিত হতে পারি, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে যাঁরা এ-চেষ্টার পরিচয় দিয়ে আমাদের স্তম্ভিত করে দিচ্ছেন তাঁরা শুধুমাত্র ওই কথাটুকুর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন—তার বাইরে আর কিছুতেই যেতে পারছেন না!

মোটের উপর যেন একটা ঘোলা-জলের ডোবা। স্রোত নেই, তরঙ্গ নেই,—শান্ত, নিরুপদ্রব। আর অমন শান্ত বলেই ডোবাটা পানায় ভরে যাচ্ছে। তাতে জন্ম হচ্ছে অজস্র উদ্ভিদের, পোকামাকড়ের। জল পচছে—পচাজলে বীজাণুর বংশ বাড়ছে। কিন্তু তাই বলে তো আর একে সত্যিই জীবনের ছন্দে মুখর বলা চলে না।

মধ্যযুগে মানুষের চিন্তাধারা নানাভাবে গেঁজিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু বাড়তে পারে নি। কেন পারে নি?

এর কারণ কি শুধুই জমিদার, সামন্ত আর পুরোহিতদের কড়া শাসন নাকি?

এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ নেই যে জমিদার আর সামন্ত পুরোহিতদের কড়া শাসন মধ্যযুগের মানুষের চিন্তাধারাকে

পঙ্গু করে রাখবার আয়োজন করেছিলো। কিন্তু শুধু ওইটুকু বুঝলেই মধ্যযুগের অন্ধকারকে পুরোপুরি বোঝা হবে না। কেননা, ওই শাসনের কথা ছাড়াও আরো গভীর একটা কারণ ছিলো।

আসলে মধ্যযুগের সমাজের গড়নটাই এমন যে তার মধ্যে পৃথিবীকে নতুন করে, ভালো করে, জয় করবার তাগিদটা থাকতে পারে না। আর, জয় করবার তাগিদ ছিলো না বলেই ভালো করে চেনবার তাগিদও ছিলো না। কেননা, পৃথিবীকে জয় করবার উলটো পিঠেই হলো পৃথিবীকে চেনবার বা জানবার কথা। চেনা আর জয় করা আসলে আলাদা কথা তো নয়—একই কথার এ-পিঠ ও-পিঠ।

কিন্তু পৃথিবীকে বেশি করে জয় করবার তাগিদ ছিলো না কেন? এ-প্রশ্নের জবাবটা ঠিকমতো পেতে হলে সে-সমাজের মানুষগুলির কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে।

ইউরোপের সামন্তসমাজটির কথাই ভালো করে ভেবে দেখা যাক। সে-সমাজে মানুষ বলতে তো মোটের উপর দু রকম: একদিকে সামন্ত জমিদারের আর পুরোহিতদের দল, আর একদিকে ভূমিদাসদের দল। সামন্ত, পুরোহিত প্রভৃতিদের অবশ্যই ধনসম্পদ চাই, বিলাসের জিনিস চাই! কিন্তু তার জন্যে তো অজস্র ভূমিদাস রয়েছে,—তারাই বেগার খেটে দেবে। আর এইভাবে অনেক মানুষের তৈরি সম্পদকে আত্মসাৎ করে ভোগ করতে পেলেই সামন্ত প্রভৃতিদের পক্ষে মনের আশ মিটিয়ে বিলাস উপভোগ করবার অবকাশ পাওয়া সম্ভব হবে। অপর দিকে

ভূমিদাসের দল : জমির সঙ্গে তারা যেন শিকল-বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাদের কপাল অনড়-অচল—হাজার বেশি চেষ্টা করলেও যে তাদের সত্যিকারের ভাগ্য-পরিবর্তন হবে এমন কোনো সম্ভাবনা তারা দেখতে পায় না। আর যারা এই-ভাবে ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না তারা কিসের উৎসাহে পৃথিবীকে বেশি করে জয় করবার জন্যে আগুয়ান হতে পারে ?

মোটের উপর এই হলো মধ্যযুগের চেহারা। আর এরই দরুন আবিষ্কারের অভিযানে অমন ভাঁটা পড়েছিলো।

মধ্যযুগের ওই সামন্ত-সমাজ ভেঙে কেমন করে আধুনিক যুগের নতুন সমাজ-ব্যবস্থা দেখা দিলো তার আলোচনা "জানবার কথা"-র অন্য বইতে করা হয়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রেও যাঁরা জীবনকে বিপন্ন করে জ্ঞানের মশাল জ্বেলে মধ্যযুগের অন্ধকারকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের পরিচয়ও কিছুকিছু সেখানেই দেওয়া হয়েছে। এখানে বিশেষ করে আলোচনা করা যাক, আধুনিক যুগের দর্শনের ইতিহাসটুকু।

।। আধুনিক যুগ : বুদ্ধি না অভিজ্ঞতা ? ।।

আধুনিক যুগের শুরুতে চিন্তাশীলদের সামনে সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা হলো বিজ্ঞান ! এই বিজ্ঞানের শক্তিতেই মানুষ পৃথিবীতে যেন নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে চলেছে। তাই দার্শনিকদের সামনেও একমাত্র সমস্যা হলো, বিজ্ঞানকে স্পষ্টভাবে চিনতে হবে, বুঝতে হবে। ঠিক যে-কারণটির দরুন বিজ্ঞানের এমন অপরূপ সার্থকতা তা ভালো করে জানতে হবে আর তারপর চেষ্টা করতে হবে

দর্শনের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের মূল পদ্ধতিকে মেনে বিজ্ঞানের সমান সাফল্য অর্জন করবার। আধুনিক যুগের শুরুতে প্রত্যেকটি বড়ো দার্শনিকেরই এই হলো মূল চিন্তা ও চেষ্টা।

বিজ্ঞান মানে কি? বিজ্ঞানের এতোখানি সার্থকতা ঠিক কেন?

দেখা গেলো, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে এগিয়েই দার্শনিকদের দল মোটের উপর দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদলের নাম দেওয়া হয়, বুদ্ধিবাদী। আর একদলের নাম দেওয়া হয়, অভিজ্ঞতাবাদী।

বুদ্ধিবাদী কারা? তিনজন খুব বড়ো দার্শনিকের নাম করা হয়: দেকার্থস্, স্পিনোজা, লাইব্‌নিথ্‌স্।

অভিজ্ঞতাবাদী কারা? প্রধানত তিনজন: লক, বার্কলি, হিউম্।

এঁদের মূল বক্তব্যগুলি একে একে দেখা যাক।

বুদ্ধিবাদীদের মতে বিজ্ঞানের মধ্যে সেরা হলো গণিত। তাই গণিতের পদ্ধতিটাকেই দর্শনের ক্ষেত্রে আমদানি করতে হবে। দর্শনের ক্ষেত্রে আমদানি করা মানে? মানে হলো, দার্শনিকেরা যে-সব সমস্যার সমাধান খুঁজছেন সেইগুলিরই সমাধান খুঁজতে হবে, কিন্তু গণিতবিজ্ঞানীরা যে-ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন সেইভাবে অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ কিনা, সমস্যাগুলো দর্শনের কিন্তু পদ্ধতিটা হবে গণিতের। কেননা বুদ্ধিবাদীদের মতে গণিতের পদ্ধতিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরাকাষ্ঠা।

দর্শনের সমস্যা মানে কী? ছোটো করে বললে বলা যায়,

পুরো দুনিয়ার একটা ব্যাখ্যা খোঁজবার সমস্যা। গণিতের পদ্ধতির সাহায্যে এ-সমস্যার মীমাংসা কী করে করা যাবে?

প্রথমে দেখা যাক, গণিতের পদ্ধতি বলতে বুদ্ধিবাদীরা ঠিক কী মনে করলেন?

এঁরা মনে করলেন, গণিতের পদ্ধতি বলতে শুধুমাত্র বুদ্ধির উপর নির্ভর করে অগ্রসর হবার চেষ্টা। অভিজ্ঞতা নয়, বুদ্ধি। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে,—ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে,—জ্ঞান পাবার চেষ্টা নয়। আর এইজন্যেই এদের বলা হয় বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। এঁরা কেন মনে করলেন গণিতবিজ্ঞান বিশুদ্ধ বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুর উপরই নির্ভর করে না? পিথাগোরপন্থী বলে গ্রীক দার্শনিকদের কথা আলোচনা করবার সময় আমরা এ-প্রশ্নের কিছুটা জবাব দেখেছি: গণিতবিজ্ঞানে যা নিয়ে আলোচনা তাকে চোখে দেখা যায় না, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না,—বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যেই তা জানা সম্ভব। তাই বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই হলো গণিত-বিজ্ঞানের প্রকৃত পদ্ধতি। যেমন ধরো, গণিতবিজ্ঞানের একটি শাখার নাম পাটিগণিত। তার আলোচনা সংখ্যা নিয়ে। কিন্তু সংখ্যাকে কখনোই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। পিথাগোরপন্থীদের কথা বলবার সময় এর কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছি। এখানে, গণিতবিজ্ঞানের আর একটি শাখার উদাহরণ দেখা যায়: জ্যামিতি। রেখা ইত্যাদি নিয়েই তো জ্যামিতির আলোচনা। তাই ওই রেখার কথাটাই দেখা যাক। রেখা মানে কী? জ্যামিতির বর্ণনা অনুসারে, রেখার শুধু

দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ নেই। কিন্তু এ-হেন কোনো কিছু কি চোখে দেখা সম্ভবপর? নিশ্চয়ই নয়। জ্যামিতি পড়বার সময় আমরা কাগজের ওপর আঁচড় কেটে যেগুলিকে রেখা বলি সেগুলি তো আর সত্যিই রেখা নয়। কেননা সেগুলির দৈর্ঘ্য ছাড়াও প্রস্থ রয়েছে: যতো সূক্ষ্ম করেই আমরা আঁকি না কেন, কিছু না কিছু প্রস্থ থাকতে বাধ্য—প্রস্থ একটুও না থাকলে চোখেই পড়বে না। তাই জন্যেই তো, জ্যামিতি পড়বার সময় আমরা একটা আঁচড় কেটে বলি, ধরা যাক এটা একটা রেখা। "ধরা যাক" বলি কেন? কেননা, কাগজের ওপর যেটাকে দেখছি সেটা আসলে রেখা নয়—সেটার প্রস্থ আছে যে! তবুও বোঝবার সুবিধের জন্যে সেটাকেই সাময়িকভাবে রেখা বলে ধরে নিচ্ছি। যেমন কিনা, ভূগোল পড়াবার সময় যদি একটা কমলালেবু দেখিয়ে বলি, ধরা যাক এই হলো পৃথিবী। তার মানে তো আর কমলালেবুটাই পৃথিবী হয়ে যাবে না।

অতএব, বুদ্ধিবাদীরা মনে করলেন, গণিতবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবার কোনো লক্ষণই নেই। গণিতবিজ্ঞান শুধু-মাত্র বুদ্ধির উপরই নির্ভর করে। আর আদর্শ বিজ্ঞান বলতে যেহেতু ওই গণিতবিজ্ঞানই, সেইহেতু বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই হলো বিজ্ঞানের আদর্শ।

এইবারে দেখা যাক, ওই পদ্ধতির সাহায্যে দর্শনের সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে বুদ্ধিবাদী দর্শনিকের দল শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌছতে বাধ্য হলেন।

দর্শনের সমস্যা হলো পুরো দুনিয়ার একটা ব্যাখ্যা খোঁজবার

চেষ্টা। এবং বুদ্ধিবাদীরা সে-সমস্যার সমাধান খুঁজতে এগুলেন শুধুমাত্র বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই, অভিজ্ঞতার জবানবন্দীটাকে একেবারে সরাসরি বাদ দিয়েই।

কিন্তু অভিজ্ঞতার জবানবন্দীটাকে যদি একেবারে বাদ দেওয়া যায় তাহলে সেইসঙ্গেই পুরো দুনিয়া সম্বন্ধে চেতনাটাও কি বাদ পড়ে যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। কেননা দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের চেতনার সম্পর্কটা যে ওই অভিজ্ঞতার সূত্রেই আবদ্ধ। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি; এইভাবে যদি জানতে না পারতাম তাহলে দুনিয়ার কথাটা আমাদের চেতনায় উঁকি দিতো কেমন করে? তাই অভিজ্ঞতার মূল্য একেবারে অস্বীকার করতে হলে শেষ পর্যন্ত দুনিয়াটাকেই অস্বীকার করে বসতে হবে যে!

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বেলায় ঠিক তাই হলো। ওই বুদ্ধিবাদের সঙ্গে তাল রেখে দুনিয়াটার ব্যাখ্যা খুঁজতে এগিয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত পুরো দুনিয়াটাকেই অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। কীভাবে, তার সামান্য পরিচয় দেখা যাক।

বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে প্রথম দার্শনিক হলেন দেকার্থস্। দেকার্থস্-কেই অনেক সময় আধুনিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। দেকার্থস্ বললেন, শুরু করতে হবে সংশয় থেকে। কোনো কিছুই সরাসরি মেনে নেবো না; তার বদলে বরং যতোক্ষণ পারবো ততোক্ষণ সন্দেহ করবো। সবকিছুকে সন্দেহ করবো, সব কথাই সন্দেহ করবো; আর এইভাবে সন্দেহ করতে করতে এগিয়ে যদি শেষ পর্যন্ত এমন কোনো কথা পাই যাকে আর কোনোমতেই সন্দেহ করা চলছে না তাহলে শুধুমাত্র সেই কথাটিকেই সত্যি বলে

স্বীকার করবো। সন্দেহ বা সংশয়ের ওপর এতোখানি ঝোঁক কেন? এ হলো মধ্যযুগের অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা। মধ্যযুগের মূল কথাটা কী ছিলো? মানতে হবে। দেকার্থস্-এর মূল কথাটা কী হলো? মানবো না, সন্দেহ করবো—সংশয়ের উপরই নির্ভর করে এগুবো।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যা জানি তা কি আমরা সত্যি বলে মানবো? দেকার্থস্ বললেন, নিশ্চয়ই নয়। কেননা, ইন্দ্রিয় তো প্রতি পদেই আমাদের বঞ্চনা করছে, ঠকাচ্ছে। আধো অন্ধকারে দড়িতে সাপ দেখি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্নে দেখি কতো অপরূপ ব্যাপার। যতোক্ষণ স্বপ্ন দেখছি ততোক্ষণ তো এগুলিকে প্রত্যক্ষের মতোই স্পষ্ট মনে হয়। তাহলে স্পষ্ট প্রত্যক্ষেরই বা দাম কী? অতএব, প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করা চলবে না; প্রত্যক্ষকে সন্দেহ করা যায়, প্রত্যক্ষকে সন্দেহ করতে হবে।

কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষই নয়। দেকার্থস্ বললেন, এইভাবেই একে একে ভেবে দেখতে হবে, আরো কী কী কথা সন্দেহ করা যায়, আরো কী কী বিষয় সন্দেহ করা সম্ভব।

কিন্তু সন্দেহ করতে করতে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় পোঁছে দেকার্থস্ দেখলেন আর কোনো-মতেই সন্দেহ করা চলছে না। সন্দেহর সেই সীমারেখাটা ঠিক কোথায়? কোনখানে পোঁছে আমরা বুঝতে পারি, এবার মানতে হবে—আর সন্দেহ করা সম্ভব নয়? আমি নিজে আছি কি না, এই প্রশ্নটির বেলায়। কেননা, আমি যদি নিজের অস্তিত্বকেও সন্দেহ করবার চেষ্টা করি তাহলেও,—ওই সন্দেহ করবার

জন্যেই,—আমি নিজের অস্তিত্বের কথা মানতে বাধ্য হবো। কেননা, আমিই যদি না থাকি তাহলে সন্দেহটা করবে কে?

অতএব, সন্দেহ করতে করতে এগিয়েই শেষ পর্যন্ত একটি অবধারিত সত্য পাওয়া গেলো, জানা গেলো এমন কথা যা আর কোনোমতেই সন্দেহ করা যায় না। সে কথা হলো: আমি আছি। দুনিয়া বলতে যা কিছু তা সবই সন্দেহজনক হতে পারে, কিন্তু ওই একটি কথাকে কোনোমতেই, কোনোভাবেই, সন্দেহজনক মনে করবার উপায় নেই। আর তাই, দর্শনের ক্ষেত্রে যদি অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি চাই তাহলে ওই কথাটি থেকেই শুরু করতে হবে।

প্রথম প্রশ্ন হলো, 'আমি আছি' মানে কী? 'আমি' বলতে ঠিক কী বোঝায়? 'আমি' মানে কি আমার এই দেহটুকু? দেকার্থস্ বললেন, তা মোটেই নয়। তা হতেই পারে না। কেননা স্বপ্নের সময় আমি তো এই দেহ সম্বন্ধেই নানান রকমের কথা মনে করি, অথচ ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারি সব ভুল। তাই 'আমি' মানে 'আমার দেহ' নয়। কিন্তু 'আমি' বলতে যদি আমার এই দেহটিকে না বুঝি তাহলে আর কী বোঝা সম্ভব? দেকার্থস বললেন, 'আমি' মানে আমার চিন্তাশীলতা, আমার বুদ্ধি। কেননা, আমার এই চিন্তাশীলতার পরিচয়েই আমার সত্তার অবধারিত প্রমাণ। আমি আছি— এ-কথার চূড়ান্ত প্রমাণ হলো, আমি চিন্তা করছি।

আর, দেকার্থস্ বললেন, এই কথাটি থেকেই সত্য-বিচারের কষ্টিপাথরটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কিনা,

কোন কথা সত্যি আর কোন কথা মিথ্যে তা ঠিক করতে হলে ভেবে দেখতে হবে কোন কথাটা 'আমি আছি' বা 'আমি চিন্তা করছি', এই বোধটির মতোই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। আমার বুদ্ধির কাছে যে-কথা এতোখানি স্বচ্ছ ও নির্মলভাবে প্রতিভাত হচ্ছে সে-কথাই সত্যি।

তার মানে বুদ্ধির বিচারটাই চূড়ান্ত বিচার।

এর পর দেকার্থস্ প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে আমার বুদ্ধির কাছে ওই রকমই স্বচ্ছ ও নির্মল একটি ধারণা হলো, ঈশ্বরের ধারণা। তাই মানতেই হবে, ঈশ্বর আছেন। আর ঈশ্বর যে-হেতু মঙ্গলময়,—প্রতারক নন,—সেই হেতু মানতেই হবে যে তিনি আমাদের কাছে যে-জগৎটাকে প্রতিভাত করছেন সেই জগৎটাও মিথ্যে হতে পারে না। আর এইভাবে, ঠিক যে-কথাগুলিকে সন্দেহ বা সংশয় করে দেকার্থস্ তাঁর দর্শনের সূত্রপাত করেছিলেন ঠিক সেই কথাগুলিকেই স্বীকার করে নিয়ে,—সেগুলিকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে,—তিনি তাঁর দর্শনের উপসংহার করলেন।

কিন্তু তা হয় না—যেন এই কথাটিই দেখিয়ে দিতে চাইলেন স্পিনোজা। স্পিনোজাও শুরু করলেন বুদ্ধিবাদ থেকে, দেকার্থস্-এর মতোই গণিতশাস্ত্রের আদর্শটিকে সবচেয়ে বড়ো আদর্শ মনে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেকার্থস্ শেষ পর্যন্ত এমন কয়েকটি কথা মেনে নিয়েছেন, এমন চিন্তাধারার সঙ্গে আপোস করেছেন, যা করতে গেলে বুদ্ধিবাদকেই বিসর্জন দিতে হয়। অর্থাৎ কিনা আপোসহীন বুদ্ধিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ঠিক কী,

এ-কথা দেকার্থস্ যেন দেখেও দেখেন নি, বুঝেও বোঝেন নি। সে-কথা ধরা পড়লো স্পিনোজার দর্শনে। স্পিনোজাই দেখালেন, শুরুতে যদি বিশুদ্ধ বুদ্ধিকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস মনে করা হয়, যদি ধরে নেওয়া হয় যে গণিতবিজ্ঞানের আদর্শটাই দর্শনের আদর্শ, তাহলে আর শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় পাওয়া এই জগৎটিকে,—জগতের পরিবর্তনকে,—কোনো কিছুকেই সত্যের মর্যাদা দেওয়া চলে না। বলতেই হয়, জগৎ মিথ্যা, গতি মিথ্যা,—রূপহীন, গুণহীন, গতিহীন, অবর্ণনীয় এক ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সেই নিরাকার, নির্বিকার আর নির্‌গুণ ব্রহ্মটিকে চিনতে হলে অভিজ্ঞতার কাছ থেকে পাওয়া সবরকম ধ্যানধারণাকেই মন থেকে বিসর্জন দিতে হবে।

বুদ্ধিবাদের চূড়ান্ত পরিণতিটা ঠিক এই রকমই না হয়ে উপায় নেই। কেননা বুদ্ধিবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে যা জানছি তার কোনো মূল্যই নেই ; সে-সব কথা সত্যি হতেই পারে না। এদিকে, রূপ রস শব্দ গন্ধ জন্ম মৃত্যু, যা-কিছু তা সবই ওই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে জানা, অভিজ্ঞতায় পাওয়া, প্রত্যক্ষভাবে চেনা।

তাই স্পিনোজার দর্শনের মূল কথাটা জগৎ-নাশের কথাই। জগতের ব্যাখা খুঁজতে গিয়ে তিনি পুরো জগৎটিকেই একেবারে সরাসরি উড়িয়ে দিলেন। স্পিনোজার ওই নির্বিকার-নিরাকার ব্রহ্মটির বর্ণনা করতে গিয়ে তাই হেগেল বলছেন : এ-যেন এক সিংহের গুহা : গুহার দিকে এগিয়ে যাবার পদচিহ্ন রয়েছে কিন্তু গুহা থেকে বেরিয়ে আসবার পদচিহ্ন নেই। অর্থাৎ, জগতের

ব্যাখ্যা খুঁজতে এগিয়ে ওই ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছলে দেখা যায় জগৎ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে : তাই জগৎ থেকে ব্রহ্মের দিকে এগুনো যায়, কিন্তু ব্রহ্ম থেকে আর জগতের দিকে ফিরে আসা যায় না।

আর, এই হলো বুদ্ধিবাদের প্রকৃত সংকট। অভিজ্ঞতাকে একেবারে তুচ্ছ করে তুমি যদি বিশুদ্ধ বুদ্ধিকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস মনে করো তাহলে আর এই পরিবর্তনশীল বিচিত্র জগৎটিকে সত্য বলে মানবার কোনো উপায় থাকবে না

স্পিনোজার পর লাইব্‌নিথ্‌স্‌। লাইব্‌নিথ্‌স্‌ও বুদ্ধিবাদী ; কিন্তু একদিক থেকে বলা যায় তাঁর প্রধান চেষ্টা হলো বুদ্ধিবাদকে ওই সংকট থেকে বাঁচাবার, —অর্থাৎ বৈচিত্র্যময় এই জগৎটিকে স্পিনোজার সর্বগ্রাসী ব্রহ্মের কবল থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা। কিন্তু ওই বুদ্ধিবাদের প্রতি অটল আস্থা বজায় রেখে কি সত্যিই তা সম্ভব? সম্ভব নয়। তাই, বুদ্ধিবাদকে মেনেও লাইব্‌নিথ্‌স্‌ অন্য রকম কথাবার্তার সঙ্গে কিছুটা রফা করবার চেষ্টা করতে বাধ্য হলেন। কী রকম, তাই দেখা যাক।

গ্রীক দার্শনিক জেনো আর হেরাক্লাইটাসের মধ্যে বিরোধের কথাটা মনে আছে? জেনো বলেছিলেন, বুদ্ধির কাছে সবচেয়ে চূড়ান্ত দাবি হলো : দুটো বিরুদ্ধ কথাকে একই সঙ্গে সত্যি বলে স্বীকার করা যায় না। হয় বলো 'হঁা' আর না-হয় তো বলো 'না'—কিন্তু 'হাঁ আর না' দুটো কথাই এক সঙ্গে বলবার উপায় নেই। এই নিয়মটিকেই অ্যারিষ্টট্‌ল্‌ কীভাবে যুক্তি-বিজ্ঞানের মূল নিয়ম বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তাও আমরা আলোচনা করেছি।

কিন্তু লাইব্‌নিথ্‌স্‌ বললেন, এই নিয়মটিকেই একমাত্র নিয়ম বলে মানা যায় না। কেননা, পৃথিবীতে যে-সব ঘটনা ঘটছে তা এই নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। একটা ঘটনাকে বিচার করলেই লাইব্‌নিথ্‌স্‌-এর কথাটা বুঝতে পারা যাবে। যেমন ধরো, আমি এ-ঘরে রয়েছি—এটা একটা বাস্তব ঘটনা। কিন্তু এর উলটোটাও তো হতে পারতো--হতেই পারতো যে আমি এ-ঘরে নেই। বাস্তব ঘটনার দিক থেকে দুটো কথাই সমান সত্যি হতে পারে। অথচ, বুদ্ধির ওই মূল দাবির দিক থেকে,— যে-দাবিকেই কিনা অ্যারিষ্টট্‌ল্‌ একমাত্র নিয়ম বলে প্রচার করলেন,—তা সম্ভব নয়। তাই লাইব্‌নিথ্‌স্‌ বললেন, ওই নিয়ম ছাড়াও আরো একটি নিয়ম মানা দরকার। তিনি তার নাম দিলেন, 'ল অব সাফিসিয়েণ্ট রিস্‌ন্‌'—প্রতিটি ঘটনা যে-ভাবে ঘটছে তার পিছনে কোনো না কোনো পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে: আমি যে এ-ঘরে কেন রয়েছি, অন্য ঘরে নেই, তার একটা পর্যাপ্ত কারণ থাকতে বাধ্য। এই পর্যাপ্ত কারণটির হদিস পাওয়া যাবে কোথা থেকে? বিশুদ্ধ বুদ্ধির কাছ থেকে? লাইব্‌নিথ্‌স্‌ বললেন, তা নয়। তার বদলে, হদিস পাওয়া যাবে ঘটনা-রাজ্য থেকে, বাস্তব পৃথিবীর দিক থেকে। কিন্তু, লাইব্‌নিথস্‌কে আমরা প্রশ্ন করবো, এই বাস্তব পৃথিবীটার খবর পাওয়া যাবে কী করে? শুধু মাথা খাটিয়ে? নিশ্চয়ই নয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া বাস্তব পৃথিবীর খবর পাওয়া অসম্ভব। আর তাই বলছিলাম, লাইবনিথ্‌স্‌ এ-কথা মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন—বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত এমন কথার সঙ্গে রফা করতে বাধ্য হলেন যা আসলে

বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধ কথাই।

এই হলো আধুনিক দর্শনে বুদ্ধিবাদের ইতিহাস। সে-ইতিহাসের মূল কথা হলো, যদি একেবারে আপোসহীনভাবে বুদ্ধিবাদকে মানতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত জগৎটাকে উড়িয়ে না দিয়ে উপায় নেই।

॥ অভিজ্ঞতাবাদ : লক্‌, বার্কলি, হিউম্‌ ॥

এই বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধেই তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন আর একদল দার্শনিক। তাঁদের বলা হয় অভিজ্ঞতাবাদী, কেননা তাঁদের মতে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো অভিজ্ঞতা। কিন্তু, মজা হচ্ছে, এই সম্প্রদায়টিরও চূড়ান্ত পরিণতিটা মোটের উপর একই রকম : জগৎ বলে কিছু নেই—সবকিছুই আমার মনের ধারণা, আমার মনগড়া ব্যাপার। অভিজ্ঞতাবাদ কেমন-ভাবে এই কথায় গিয়ে পৌছলো,—এবং পোঁছতে বাধ্য ছিলো,—তাই দেখা যাক।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে প্রধানত তিনজন দার্শনিকের নাম করা হয় : লক, বার্কলি, হিউম। লক অবশ্য বাইরের জগৎটাকে একেবারে উড়িয়ে দেন নি, কিন্তু লকের পর বার্কলি দেখালেন অভিজ্ঞতাকেই যদি জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে মানতে হয় তাহলে জগৎকে স্বীকার করবার কোনো উপায়ই থাকে না। বার্কলির বক্তব্যটাকেই আরো চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে গেলেন হিউম।

বার্কলির কথাটাই আগে দেখা যাক। বার্কলি বললেন,

ঠিক যেটুকু সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেইটুকুকেই সত্যি বলে মানবো। কিন্তু অভিজ্ঞতা হচ্ছে কী সম্বন্ধে? সাধারণত অবশ্য আমরা মনে করি, অভিজ্ঞতা হচ্ছে পৃথিবীর নানা রকম জিনিসপত্র সম্বন্ধে এবং ওই পৃথিবী বা পৃথিবীর জিনিস-পত্রগুলি আমার মনের বাইরে রয়েছে। কিন্তু ভালো করে বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে যে এইসব কথাবার্তা আসলে ভুল। কেননা, আমার মনের বাইরে কোনো কিছু আছে বলে আমার কখনোই কোনো অভিজ্ঞতা হয় না; অভিজ্ঞতা হয় শুধুমাত্র মনের ধারণা সম্বন্ধে। যেমন ধরো, একটা কমলালেবু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানটা। খুঁটিয়ে বিচার করো—দেখো এই জ্ঞানটার আসল মানে কী? মিষ্টি আস্বাদ: কিন্তু আস্বাদ মানে তো আমারই একটা অনুভূতি। লালচে দেখতে: কিন্তু তার মানে তো শুধুই আমার একটা অনুভূতি। স্পর্শ করলে ঠাণ্ডা লাগে: কিন্তু ঠাণ্ডাই বলো আর গরমই বলো, আমার অনুভূতি ছাড়া তা আর কি! এইভাবে কমলালেবু বলতে আমাদের যতোটুকু জ্ঞান তার সবটুকুই হলো কয়েকটি অনুভূতি—কয়েকটি মনের ধারণা। এখন প্রশ্ন হলো, অনুভূতি বা মনের ধারণার এই গুচ্ছটি ছাড়া কমলালেবু বলে বাইরের পৃথিবীর কোনো বাস্তব জিনিসকে কি আমরা কখনো জানতে পারি? বার্কলি বললেন, নিশ্চয়ই নয়—কেননা, জানা মানেই মনের ধারণা হিসেবে পাওয়া, অনুভূতি হিসেবে পাওয়া। আর যদি তাই হয় তাহলে মনের বাইরে কমলালেবু বলে কোনো জিনিস আছে এ-কথা মানা যায় না। যা জানি না, যা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই,

তাকে সত্যি বলে মানা চলবে না।

কমলালেবুটার বেলায় যে-কথা, সবকিছু সম্বন্ধেই সেই কথা। তার মানে, মনের বাইরে কোনো কিছুকেই সত্যি বলে মানা চলে না। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকেই শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র মনের ধারণা বলেই স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু, কথা হলো, কার মনের ধারণা? এ কি শুধুই আমার নিজের মনের নাকি? আমার একার মনের নাকি? যদি তাই হয় তাহলে তো মানতেই হবে যে আমি চোখ বুঁজলেই পৃথিবী ফুরিয়ে যাবে, উপে যাবে সমস্ত বিশ্বসংসার। কেননা, সবকিছুই যদি আমার মনের ধারণা হয় তাহলে আমি চোখ বোঁজবার পরও তো আর ধারণাগুলি টেকে থাকতে পারে না।

বার্কলি বললেন, সে-ভয় নেই। কেননা, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদিও কিনা শুধুমাত্র মনের ধারণাই তবুও এ-ধারণা আমার মনের নয়। তবে কার মনের? ভগবানের বা ঈশ্বরের। তাই তোমার আমার চোখ খোলার বা চোখ বন্ধ করার উপর এগুলি নির্ভর করছে না—তার বদলে নির্ভর করছে ওই লীলাময়ের অনন্ত অভিজ্ঞতার উপরই।

কিন্তু তাই বা বলা যায় কেমন করে?—এই প্রশ্ন তুললেন হিউম। যদি একবার স্বীকার করা হয় যে স্পষ্ট অভিজ্ঞতায় যেটুকু জানবো শুধুমাত্র সেইটুকুকেই সত্যি বলে মানবো তাহলে ওই ভগবান বা ঈশ্বরকে মানবার কোনো উপায় থাকে না। কেননা, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের কোনো রকম অভিজ্ঞতা হয় না। অতএব, অভিজ্ঞতাবাদকে তুমি যদি অভ্রান্ত মনে করো তাহলে

তোমাকে শেষ পর্যন্ত স্বাকার করতেই হবে যে মনের ধারণা ছাড়া আর কিছুই সত্যি নয়। এমন কি, তুমি আমি বা আর পাঁচজন মানুষকেও সত্যিকারের রক্তমাংসে গড়া মানুষ হিসেবে মানবার জো নেই—সবই ধারণা, শুধুই ধারণা। তুমি নেই আমি নেই, বিশ্ব নেই, সংসার নেই, কিছু নেই—তার বদলে রয়েছে শুধুমাত্র ধারণা, অজস্র ধারণা।

এই হলো অভিজ্ঞতাবাদের চরম কথা। অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে যদি স্বীকার করা হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত এই রকম একটা সিদ্ধান্তে না পৌঁছে উপায়ই নেই।

বিজ্ঞানের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে, মধ্য যুগের অন্ধকার কাটিয়ে আধুনিক যুগের দার্শনিকেরা একেবারে নতুন ভাবে সত্যের সন্ধানে অভিযান করবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ কোন এক অসম্ভবের রাজ্যে তাঁরা আমাদের নিয়ে যেতে চাইলেন?

একদিকে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের দল: বুদ্ধিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি হলো জগৎটাকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা।

আর একদিকে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের দল: অভিজ্ঞতাবাদেরও চূড়ান্ত পরিণতি হলো বিশ্বসংসারটাকে একেবারে মনের ধারণামাত্র বলবার চেষ্টা।

তাহলে উপায়?

একটা উপায়ের নির্দেশ দিতে চাইলেন ইম্যানুয়েল কাণ্ট। তিনি বললেন, মধ্যযুগের পর দর্শনের ক্ষেত্রে কোলাহল যতোই হোক না কেন, আসল কাজ একটুও এগোয়নি। দর্শন সেই ঘোলাজলের ডোবাই হয়ে রয়েছে, দর্শনের ক্ষেত্রে না এসেছে নিশ্চয়তা, না দেখা দিয়েছে অগ্রগতি। তার কারণ বিজ্ঞানের প্রকৃত রূপ যে ঠিক কী তা না ধরতে পেরেছে বুদ্ধিবাদ, না ইন্দ্রিয়বাদ। দুটো মতবাদই ভুল, কেননা দুইই অর্ধসত্যকে পূর্ণ সত্য মনে করতে চায়। শুধু বুদ্ধি দিয়েও জ্ঞান পাওয়া যায় না, শুধু অভিজ্ঞতার সাহায্যেও জ্ঞান পাওয়া যায় না,—জ্ঞান পেতে হলে বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার মিলন হওয়া দরকার। এই মিলনের দরুনই বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্ভবপর হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান আর গণিতবিজ্ঞান দুয়ের মূলেই এই কথা—বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের কথা। এমন কি, গণিতবিজ্ঞানও যে অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়া সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ হিসেবে কাণ্ট বললেন চোখের সামনে ছবি না রাখলে জ্যামিতি পড়া যায় না, আঙুলের রেখার বা ওই রকম কিছুর সাহায্য না নিলে পাটিগণিতও সম্ভব নয়। অপরপক্ষে শুধু অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে পদার্থবিজ্ঞানেও আবিষ্কার হয় না। এ-কথা কাণ্ট ঠিক কী রকম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন তা আলোচনা করবার জায়গা এখানে হবে না; মোটের উপর তাঁর মূল সিদ্ধান্তগুলির শুধুমাত্র উল্লেখ করাই সম্ভব। কাণ্ট বললেন, অভিজ্ঞতার সাহায্যে জ্ঞানের

মালমশলা পাওয়া যায়; কিন্তু মালমশলার স্তূপই ইমারত নয়—অভিজ্ঞতায় পাওয়া মালমশলা থেকে জ্ঞানের ইমারত গাঁথবার জন্যে বুদ্ধির কারিগরি দরকার। আবার শুধু কারিগরির সাহায্যেও ইমারত গাঁথা যায় না, মালমশলারও দরকার। তেমনি শুধুমাত্র বুদ্ধির কাছ থেকেও জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া বুদ্ধি নেহাতই ফাঁপা, বুদ্ধি ছাড়া অভিজ্ঞতা নেহাতই অন্ধ, অর্থহীন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অমন যে আশ্চর্য সাফল্য, তার আসল কারণ হলো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে সার্থকভাবে মেলানো সম্ভবপর হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, দর্শনের ক্ষেত্রেও কি সেই সাফল্য সম্ভবপর? কাণ্ট বললেন, না—তা হয় না। কেননা, এমনই কয়েকটি বিষয় নিয়ে দর্শনের সমস্যা যেগুলির ক্ষেত্রে বুদ্ধির সঙ্গে অভিজ্ঞতাকে মেলানো সত্যিই সম্ভবপর নয়। কেন নয়? তার কারণ, দর্শনের আলোচ্য হলো আত্মা, বিশ্ব ও ঈশ্বর—এবং এই তিনটির কোনোটি সম্বন্ধেই আমাদের অভিজ্ঞতা হয় না— আত্মা সম্বন্ধে নয়, পুরো বিশ্ব সম্বন্ধে নয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে নয়।

তাহলে উপায়? কাণ্ট বললেন, উপায় নেই। মানতেই হবে যে দর্শন সম্ভব নয়—চরম সত্যের অভিযানটা ব্যর্থ হতে বাধ্য! আর ব্যর্থ হতে যে বাধ্য তার প্রমাণ হলো, মানুষ যদি তার জ্ঞানের সংকীর্ণতার কথা ভুলে চরম সত্যকে জানবার অভিযানে মেতে ওঠে তাহলে দেখা যায় দুটি বিরুদ্ধে কথাকে একই সঙ্গে সত্যের মর্যাদা না দিয়ে পারা যাচ্ছে না।

মানুষের দার্শনিক প্রচেষ্টা যে কীভাবে এই রকমই বিরুদ্ধ

ধারণার আবর্তে পড়তে বাধ্য হয় কাণ্ট তার বহু উদাহরণ দিয়েছেন। এবং দর্শন যে সত্যিই সম্ভবপর নয়, এই হলো তার চরম প্রমাণ।

॥ হেগেল ॥

কাণ্টের পর হেগেল। হেগেল দেখালেন, দর্শনের ক্ষেত্রে এই যে অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এর আসল কারণ হলো এতোদিন ধরে অ্যারিষ্টটলের শেখানো একটি ভুল যুক্তি-বিজ্ঞানকেই দার্শনিকেরা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। তাই চিন্তার ক্ষেত্রে বিরোধের সম্ভাবনা দেখলে তাঁরা আতঙ্কিত হন, মনে করেন ওই আলেয়াই বুঝি পথ ভুলিয়ে ভ্রান্তির চোরাবালিতে নিয়ে যাবে! কিন্তু এই আতঙ্ক একেবারেই অমূলক। কেননা বিরোধমাত্রই ভ্রান্তির স্বাক্ষর হওয়া দূরের কথা, এই বিরোধই হলো সবকিছুর মূল নিয়ম। তার মানে, অ্যারিষ্টটল্ যে তর্ক-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা আসলে ভুল তর্ক-বিজ্ঞান। হেগেল বললেন, সে-তর্কবিজ্ঞান বর্জন করে একেবারে নতুন এক তর্কবিজ্ঞানের প্রবর্তন করতে হবে। তিনি সেই নতুন তর্ক-বিজ্ঞানের নাম দিলেন, ডায়লেক্‌টিক্ তর্কবিজ্ঞান।

এই ডায়লেক্‌টিক তর্কবিজ্ঞানের আভাস পাওয়া গিয়েছিলো গ্রীক যুগে হেরাক্লাইটাসের দর্শনে। কিন্তু তাঁর বেলায় এই নতুন চিন্তাপদ্ধতির কথাটা যেন নেহাতই দীনদরিদ্র বেশে প্রকাশিত হয়েছিলো। অপরপক্ষে, আধুনিক যুগে হেগেলের মতো অমন বিরাট পণ্ডিত খুব কমই জন্মেছেন।—তাঁর সময় পর্যন্ত মানব-

জাতির সবটুকু অভিজ্ঞতা, মানুষের সবরকম আবিষ্কার, তিনি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তাই হেগেলের রচনায় ডায়লেক্‌টিক যুক্তি-বিজ্ঞানের যে-বিকাশ হলো তার সমৃদ্ধি অতি আশ্চর্য।

ডায়লেক্‌টিক্যাল্ যুক্তিবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির কথা একটু পরে তুলবো। তার আগে হেগেল-দর্শনের অন্য একটি দিকের পরিচয় দেওয়া যাক। কেননা, যুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর এই নতুন আবিষ্কারটির মূল্য অসামান্য হলেও তাঁর পুরো দার্শনিক মতবাদটি এক ভ্রান্ত কল্পনার আবরণে মোড়া ছিলো। ডায়লেক্‌টিক যুক্তিবিজ্ঞানের আসল তাৎপর্যটা উদ্ধার করতে হলে প্রথম দরকার হলো ওই কল্পনার কাঠামোকে সচেতন-ভাবে বর্জন করা।

কল্পনার আবরণ মানে কী?

এ-জগৎকে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের আবর্তে গতিশীল বলে মানলেও, হেগেল বললেন, সমস্ত গতি বা পরিবর্তনই এক চিন্ময় ব্রহ্মের বিকাশমাত্র। তাই সেই ব্রহ্মই পরম সত্য। জগৎটাকে হেগেল উড়িয়ে দিতে বা অস্বীকার করতে চান নি; কিন্তু তাঁর মতে এ-জগতের কোনো নিজস্ব সত্তা নেই—চেতনার উপর নির্ভরশীল হিসেবেই, চেতনার বিকাশ হিসেবেই এর সবটুকু সত্তা।

তার মানে, হেগেলের মতে চেতনাই সবচেয়ে চরম সত্য।

তার মানে, হেগেল হলেন ভাববাদী।

॥ জ্ঞান ও কর্ম : ভাববাদ আর বস্তুবাদ ॥

হেগেল নিজে যতো বড়ো দার্শনিক হোন না কেন, তাঁর পক্ষে

ভাববাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় নি। কেমন করে সম্ভব হবে? ভাববাদের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি,—আমরা দেখেছি ভাববাদী চিন্তাধারা আকাশ থেকে জন্মায় না, তার জন্যে মানুষের ধ্যানধারণাটুকুই দায়ী নয়—আসল দায়ী হলো সমাজের ব্যবস্থা।

মানুষের সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার দরুন ছিন্ন হয়েছিলো কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের যোগাযোগ, শ্রমের সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক। সমাজের সদর মহলে শ্রমনিরত মানুষগুলির কোনো মর্যাদা রইলো না— যে-হাত পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত তা পড়তে লাগলো চোখের আড়ালে, আর ওই ধুলোমাথা হাতগুলির সঙ্গে ধুলোর পৃথিবীটার কথাও। দার্শনিককেরা মনে করলেন, শ্রম কিছু নয়, শ্রমের বিষয় ওই বাস্তব পৃথিবীটাও কিছু নয়। চিন্তাই সব, চিন্তার উপরই নির্ভর করছে সবকিছু—দুনিয়ার মূলে চেতনা, দুনিয়াটা মনগড়া।

এরই নাম ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদ। নানান যুগে নানান ভাষায় নানান নাম দিয়ে এই মতবাদটিকেই প্রচার করবার আয়োজন দেখা যায়।

সমাজের যে-বাস্তব অবস্থার মধ্যে এই ভাববাদের বীজ লুকোনো রয়েছে সেই অবস্থাটিকে বদল না করলে এই মতবাদের মোহ থেকে চিন্তাশীলদের পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় যুগে যুগে সত্যের অভিযান এই মতবাদের আলেয়ায় ভুলেই দিকভ্রান্ত হয়েছে।

কিন্তু, ফরাসী বিপ্লবের কথা মনে আছে? সে-বিপ্লব কাঁপিয়ে

তুলেছিলো সমাজের এই পরিস্থিতিটাকে। শ্রম-নিরত মানুষের দল এগিয়ে আসবার আয়োজন করেছিলো সমাজের সদর মহলটার দিকে। আর তারই প্রভাবে চিন্তাশীলদের চেতনা থেকে যেন মুছে গেলো ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের প্রতি মোহটাও। সে-যুগের ফরাসী দার্শনিকেরা দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এই ধুলোর পৃথিবীটাকেই চরম সত্য বলে স্বীকার করতে হবে।

ভলটেয়ার। দিদারো। আরো অনেকে।

কিন্তু ওই ফরাসী বিপ্লব শ্রমনিরত মানুষদের সত্যিই তো জিতিয়ে দিতে পারলো না। সে-ইতিহাস 'জানবার কথা'র অন্য বইতে লেখা হয়েছে : ফরাসী বিপ্লবে সমাজ বদলালো, কিন্তু শ্রমিকের জয় হলো না, শ্রমের নয়। সত্যের সন্ধানীরা আবার সেই পুরোনো ভাববাদেরই নবকলেবরে নতুন অভিষেক করলেন।

তাহলে, সত্যের অভিযান আর সমাজের বদল—দুটো কথাকে আলাদা করে ভাবা চলবে না। শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে দুনিয়ার ব্যাখ্যা খুঁজলে মানুষ ভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে না, পাবে না সত্যের নির্দেশ। সত্যকে পেতে হলে সমাজকে সুস্থ করে তুলতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে শ্রমের মর্যাদা—শ্রমিকের মর্যাদা।

তাই দর্শনের সমস্যাটাকেও নতুনভাবে বোঝবার দরকার।

কার্ল মার্কস্ বললেন, এতোদিন ধরে দার্শনিকেরা দুনিয়ায় শুধু ব্যাখ্যাই খুঁজেছেন ; কিন্তু আসল সমস্যাটা হলো দুনিয়াকে বদল করবার সমস্যা।

দুনিয়াকে বদল করবার এই ডাকে সাড়া দিয়েছে আজকের পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ। পৃথিবীতে তারা সত্যি নতুন পৃথিবী গড়বে: শেষ হবে শোষণ, শেষ হবে শ্রমের অমর্যাদা, শ্রমিকের অমর্যাদা। ফিরে আসবে মানুষে মানুষে সমান সহজ সম্পর্ক, কিন্তু সেই আদিম যুগের মতো দারিদ্র্য আর অভাবের ভিত্তিতে নয়— উন্নত আর সমৃদ্ধ এক নতুন স্তরে।

আর তাই অধ্যাত্মবাদের মোহে মানুষ আর অলীক কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকবে না, পরলোকতত্ত্বের মোহে ভুলে মুক্তির আসল পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। সচেতনভাবে মানুষ জানবে, দুনিয়াকে চিনে দুনিয়াকে জয় করবার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত মুক্তি। তার মানে বিজ্ঞানের পথই, ধর্মের পথ নয়।

॥ ডায়লেকৃটিক্যাল বস্তুবাদ ॥

ওই হলো বস্তুবাদের কথা। বস্তুবাদী বলছেন, দুনিয়াটা মনগড়া নয়, কোনো রকম আধ্যাত্মিক কিছুর বিকাশ নয়। বস্তুবাদী বলছেন, যে-উপাদান দিয়ে এই পৃথিবীটি গড়া তাকে জানা যায়, চেনা যায়, পরিবর্তন করা যায়; সেই উপাদানেরই নাম হলো বস্তু, ইংরেজীতে বলা হয় ম্যাটার। দিনের পর দিন বিজ্ঞান এই বস্তু সম্বন্ধেই নতুন নতুন খবর সংগ্রহ করে চলেছে। চূড়ান্ত খবর হয়তো আজো পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে যতোটুকু খবর পাওয়া গিয়েছে তা একেবারেই তুচ্ছ।

দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ অবশ্যই অভূতপূর্ব কিছু নয়। একটু আগেই বলছিলাম, ফরাসী বিপ্লবের যুগে ফরাসী

দার্শনিকেরাও বস্তুবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সে-বস্তুবাদের দারুণ দুর্বলতা ছিলো।

কী রকম দুর্বলতা, তা ভালো করে বুঝতে হলে আগে ভেবে দেখা দরকার সত্যের সন্ধানে মানুষের অভিযানের ওই যে সুদীর্ঘ ইতিহাস—থ্যালিস্ থেকে হেগেল পর্যন্ত যে-অভিজ্ঞতা—তার মধ্যে অধ্যাত্মবাদ আর ভাববাদের মোহ যতো প্রবলই হোক না কেন, এর কি একেবারেই কোনো দাম নেই ? নিশ্চয়ই আছে। অভিজ্ঞতার ফলেই মানুষ শেষ পর্যন্ত বুঝেছিলো চিন্তার ক্ষেত্রে নির্ভুল নিয়মকানুনগুলি ঠিক কী রকম। হেগেলের দর্শনে সেই নিয়মগুলির পরিচয়।

এবং এই নিয়মগুলিরই নাম হলো ডায়লেক্‌টিক্যাল নিয়ম। এ-নিয়ম শুধুমাত্র চিন্তাজগতের নিয়ম নয়, তর্কবিজ্ঞানের নিয়ম নয়। বাস্তব পৃথিবীর পক্ষেও এই নিয়মগুলিই সত্য।

কী কী নিয়ম ? এখানে প্রধান নিয়মগুলির উল্লেখ করা যাক।

প্রথমত, পরিবর্তন বা গতিকে সবচেয়ে সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। কোনো কিছুই চিরন্তন নয়, কোনো কিছুই সনাতন নয়—সবই প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে—প্রতি মুহূর্তেই প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই একদিকে মৃত্যুর চিহ্ন আর অপরদিকে চিহ্ন নবজন্মের।

দ্বিতীয়ত, গতিকে সত্য বলে মানতে হলে বিরুদ্ধ ধারণার সংঘাতকে,—দ্বন্দ্বকে,—সত্যের মর্যাদা দিতে হয়। ডায়লেক্‌টিক অনুসারে তাই বিরোধ বা দ্বন্দ্ব মিথ্যার বা মায়ার পরিচায়ক নয়—সত্যেরই পরিচায়ক, প্রাণেরই পরিচায়ক।

তৃতীয়ত, দুনিয়ার জিনিসগুলিকে যদি আলাদা আলাদা ভাবে দেখি তাহলে সেগুলির মধ্যে হয়তো গতির রূপটা ফুটে ওঠে না। কিন্তু ডায়লেক্‌টিক অনুসারে ওই আলাদাভাবে দেখবার চেষ্টাটাই ভুল! দুনিয়ায় কোনো কিছুই একাকী নয়, কোনো কিছুরই নিজস্ব সত্তা নেই—আপাতদৃষ্টিতে যদিই বা দুটি জিনিসকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন মনে হয় তবুও ভালো করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে ওই দুটি সত্যিই সম্পর্কহীন নয়। সারা দুনিয়া জুড়ে সবকিছুর সঙ্গেই সবকিছুর সম্পর্ক রয়েছে।

চতুর্থত, ওই গতির বিকাশ হয় কীভাবে? এ-বিষয়ে ডায়লেক্‌টিক পদ্ধতি বিশেষ করে দুটি নিয়মের উল্লেখ করে। এক: অভাবের অভাব। দুই: পরিমাণ থেকে গুণ। দুটি নিয়মের সামান্য বর্ণনা দেওয়া যাক।

ধরো, খেতে একমুঠো ধান ছড়িয়ে দিলাম। কিছু দিন পরে দেখা যাবে ধান আর ধান রইলো না—সেগুলি বদলে চারাগাছ হয়ে গেলো। ধানের চারার মধ্যে কি ধান দেখতে পাও? না। তার মানে, ধান আর রইলো না—ধানের অভাব হয়ে গেলো। কিছু দিন পরে কিছু দেখা যাবে, ধানের চারাগুলিও আর নেই—সেগুলিরও অভাব হয়ে গিয়েছে,—তার বদলে পাওয়া গিয়েছে গোলাভরা ধান। গোলাভরা ধানের মধ্যে কি ধানের চারাগুলিকে আর খুঁজে পাও? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে, চারার মধ্যে বীজ-ধানের অভাব আবার গোলাভরা ধানের মধ্যে চারার অভাব—দুবার অভাব, অভাবের অভাব, এর ফলে কী হলো? শুরুতে

ছিলো ধান, শেষেও ধান—তার মানে কি শেষ পর্যন্ত শুরুর অবস্থাতেই ফিরে যাওয়া নাকি? তাও নয়। কেননা, গোলাভরা ধানের যে-গুণ রয়েছে বীজধানের মধ্যে তা ছিলো না—বীজধানটুকু দিয়ে সংসারের সবাইকার পেট ভরানো যেতো না, গোলাভরা ধান দিয়ে তা যায়। তাই মানতেই হবে, গোলাভরা ধানের মধ্যে একেবারে নতুন এক গুণের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখা যাক, তফাতটা হলো কেন? কী করে? এমনিতে দেখলে মনে হয়, দুয়ের মধ্যে আসল তফাত হলো পরিমাণের তফাত—গোলাভরা ধান অনেক বেশি, তার পরিমাণ অনেকখানি। অথচ, দেখলাম তার মধ্যে নতুন গুণেরও আবির্ভাব হয়েছে! তাহলে, পরিমাণের বদল হতে হতেই নতুন গুণেরও আবির্ভাব হয়। এরই নাম পরিমাণ থেকে নতুন গুণ।

ফরাসী বিপ্লবের যুগেও ফরাসী দার্শনিকেরা বস্তুবাদের কথা বলেছিলেন কিন্তু সে-বস্তুবাদের মধ্যে পরিবর্তনের স্থান ছিলো না। তার বদলে তাঁরা মনে করেছিলেন, দুনিয়াটা যন্ত্রের মতো।

কার্ল মার্কস্ দেখালেন, বস্তুবাদের কথাটা ঠিকই। কিন্তু যে-বস্তুবাদে গতির কথা বাদ তা ভুল। বস্তুবাদের কথা মানতে হবে, সেই সঙ্গেই মানতে হবে গতিকে। অর্থাৎ, মার্কস্-এর দর্শন হলো গতিশীল বস্তুবাদ। গতির নির্ভুল নিয়মকানুনকে আবিষ্কার করেছেন হেগেল,—তারই নাম ডায়লেক্‌টিক্। তাই গতিশীল বস্তুবাদেরই অপর নাম হলো ডায়লেক্‌টিক বস্তুবাদ।



জানবার কথা শিখতে তো ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তাহলে আবার 'জানবার কথা' কেন ?

একটা সাদামাটা জবাব আছে।

ইস্কুলের বই ছাড়াও ছেলেমেয়েরা আরো কিছু কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। ইস্কুলেও পড়ে, ইস্কুলের বাইরেও পড়ে।

আমরা ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। এ-আসরে বোঝা না-বোঝার সঙ্গে পাস-ফেলের সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে, আমরাও সহজ করে বলছি।

বিদেশী বুক অফ নলেজ ধরনের বই-গুলির মতো 'জানবার কথা' প্রধানতই পাতা উলটে ছবি দেখবার বই নয়। ছবির বই আর পড়বার বই— দুইই। এতো হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ যে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারই সারাংশ সহজ করে বলা হয়েছে 'জানবার কথা'য়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

১০ খণ্ডের তালিকা